The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 1, pp 57-78, ISSN 2306-3920

জাতীয় নাট্য আঙ্গিক ও ঢাকা থিয়েটার

NATIONAL THRETRE FORM AND DHAKA THEATRE

চৌধুরী রুবাইয়াৎ আহমেদ*

[**সার-সংক্ষেপ:** মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারা নাটক যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, ঢাকা থিয়েটার সেখানে রেখেছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। যদিও মৌলিক নাট্য ও জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের অভিপ্রায়ে ঢাকা থিয়েটারের যাত্রা শুরু, তবুও সূচনাপর্বের নাটকে দলটি পাশ্চাত্যের রীতিকেই মান্য করেছিল। তবে অচিরেই ঢাকা থিয়েটার যেন তার গন্তব্যের ইশারা সুনির্দিষ্ট করার পথে অগ্রসর হয়। শুধু যে আঙ্গিক গঠনেই নিরীক্ষা চালু ছিল তা নয়, অভিনয়রীতির দেশজধারার পুনঃসৃজনের বিষয়টিতেও গভীর মনোযোগ ঢাকা থিয়েটারের ছিল এবং দলটির অভিনয়শিল্পীদের অভিনয়শৈলী প্রাচ্য দেশীয় অভিনয় রীতির গীতল ও কাব্যিক বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করেছে। চরিত্র ও বর্ণনাকারীর অভেদাত্মক রূপ দেখতে যাওয়া যায়। নিরন্তর সন্ধানে অচিরেই ঢাকা থিয়েটার পেয়ে যায় নতুন নাট্যাঙ্গিক, 'কথানাট্য'। এ ধারায় ঢাকা থিয়েটারের প্রধান নাট্যকার সেলিম আল দীনের তিনটি রচনা *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন* ও *হরগজ*। মধুপুর অঞ্চলের ক্ষয়িষ্ণু নৃগোষ্ঠী সর্বপ্রাণবাদী মান্দাইদের জীবন, সংস্কৃতি, বেদনা, সংগ্রাম আর সংখ্যাগরিষ্ঠের অহমিকায় চালানো বাঙালির নিপীড়নকে উপজীব্য করে রচিত হয় *বনপাংশুল*। ঢাকা থিয়েটার এ ভূখণ্ডের রোদে-জলে বেড়ে ওঠা অন্য জাতি-গোষ্ঠীদের সংস্কৃতি ও তাদের বঞ্চনাকেও তুলে এনেছে মঞ্চের আলো আঁধারির মায়ায়। যার বিস্তার দেখা যায় *বনপাংশুল* নাট্যে। পাঁচালির গড়নে রচিত এ নাট্যের শরীর এবং এরপর ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে আনে *ধাবমান*। বর্ণনাত্মক বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রকাশ এই নাট্য। তা রচনা থেকে শুরু করে নির্দেশনা, মঞ্চ, অভিনয় সবকিছুকেই একাঙ্গে প্রকাশ করছে। ঢাকা থিয়েটারের এই যে চর্চা, তার প্রেরণা আজ সারা দেশে এমন কী দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও দেখতে পাওয়া যায় সেই সুস্পষ্ট ছাপ। ফলে বৃহত্তর মানুষের চর্চার মধ্যদিয়ে এক অর্থে এই ধারা জাতীয় অভিজ্ঞানের রূপই পরিগ্রহ করে বলে দাবি করা যায়। এই বিষয়টিই অত্র প্রবন্ধে আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।]

ভাষাকে কেন্দ্র করে সূচিত আন্দোলন ক্রমে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ধাবিত হয়, যা পরবর্তীতে রূপ নেয় শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে। অর্জিত হয় স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের– ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারা নাটক যে তুঙ্গস্পর্শী সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, ঢাকা থিয়েটার সেখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে শুধু 'উল্লেখযোগ্য' শব্দবন্ধে এঁটে দিলে দলটির অবদান পুরোপুরি বোঝা সম্ভবপর নয়। এই একটি নাট্যদল

* **ড. চৌধুরী রুবাইয়াৎ আহমেদ** : সহযোগী অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এ যাবৎ চর্চিত বাংলা নাটকের সামগ্রিক খোলনলচে আমূল পাল্টে দেয়। স্বাধীন দেশে ১৯৭৩ সালের ২৯ জুলাই কয়েকজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা মিলে ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনালগ্ন থেকেই 'জাতীয় নাট্য আঙ্গিক' নির্মাণের অভিপ্রায়ে যাত্রা দলটি শুরু করে। কিন্তু এই অভিপ্রায় আকস্মিক নয়, নেপথ্যে রয়েছে সুগভীর ঐতিহাসিক এবং অতিঅবশ্যই দার্শনিক প্রেরণা।

এ কথা অজানা নয় যে, দীর্ঘ প্রায় দুইশত বছর ব্রিটিশ উপনিবেশের নিগড়ে অবিভক্ত ভারত বন্দি ছিল। পরবর্তীতে অলীক ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়ে দুটি রাষ্ট্রে ভূখণ্ডটি ভাগ হয়। ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়, ধর্মীয় বিভেদরেখার প্রেক্ষাপটে। অবিভক্ত ভারতের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলাও ভাগ হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটির একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান এবং হাজার মাইল ব্যবধানে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। পরবর্তীতে মুক্তিসংগ্রামের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। এই বাংলাদেশ অবিভক্ত ভারতে পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ অংশটি চলে যায় ভারতের সীমানায়। একই ভাষা-সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার ভূখণ্ডে এঁকে দেয়া হয় বিভেদচিহ্ন, তুলে দেয়া হয় সীমানার কাঁটাতার। ব্রিটিশ উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে এই ভূখণ্ডের মানুষ মুক্তি পেলেও চিন্তার ক্ষেত্রে পরাধীনতাটুকু রয়ে যায়। উপনিবেশায়ন ক্রিয়াশীল থাকে এভাবেই। অর্থাৎ–

> উপনিবেশায়ন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যার ভেতর দিয়ে উপনিবেশের জনগণ সাংস্কৃতিকভাবে পরাধীন হয়ে পড়ে। এ সাংস্কৃতিক পরাধীনতা দেশটির চূড়ান্ত পরাজয় নির্দেশ করে। এর প্রভাব এমন গভীর যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও উপনিবেশিত দেশের পরাধীনতা বহাল থাকে। তখন দৃশ্যমান উপনিবেশ না থাকলেও মানুষের মনোজগতে ক্রিয়াশীল থাকে অদৃশ্য উপনিবেশ। প্রাক্তন উপনিবেশ নিজের চেহারা পাল্টিয়ে কর্তৃত্বের নতুন কৌশল নিয়ে ফিরে আসে (উসামা রাফিদ, 'বিউপনিবেশায়ন এবং একজন ফাঞ্জ ফানোঁ', ওয়েবসাইট)।

যে কারণে কলকাতার বাবু সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের ধারা অনুসরণ করে বাংলাদেশেও চলতে থাকে সাংস্কৃতিক অনুকরণ। বিশেষ করে নাটকে। এ অঞ্চলের নাট্যচর্চাকারীগণ ব্রিটিশ উপনিবেশের দেয়া তত্ত্বের আলোকে নাটকের চর্চা ও এ সংক্রান্ত ইতিহাস দু'শ বছরেই সীমাবদ্ধ বলে দাঁড়ি টেনে দেন। পুরোধা ব্যক্তি কিংবা এই শিল্পমাধ্যমের জনক হিসেবে গেরাসিম স্তেফানোভিচ লিয়েবেদেফকেই (১৭৪৯-১৮১৭) অভিষিক্ত করে যান। তাদের সেই বাবুগিরিতে স্থান পায় না প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের চর্চিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান সমূহ। এ যেন অবধারিতই ছিল। কেননা–

> উপনিবেশবাদ একটি জনগোষ্ঠীকে কব্জা করে তাদের মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত রূপরস ও সারবস্তুকে নিংড়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী যুক্তি দেখিয়ে উপনিবেশবাদ নিপীড়িত জনগণের অতীত ইতিহাসের দিকে হাত বাড়ায়, তাকে বিকৃত করে, কলঙ্কিত করে এবং ধ্বংস করে (ফানো, ২০০৬, পৃ. ১৫২)।

এমনই এক পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা থিয়েটার ঘোষণা দেয় জাতীয় নাট্য আঙ্গিক প্রতিষ্ঠার। তবুও সূচনাপর্বের নাটকে দলটি পাশ্চাত্যের রীতিকেই মান্য করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা মঞ্চে আনে *সংবাদ কার্টুন*, *সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ*, *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন*, *বিদায় মোনালিসা*। এগুলো মঞ্চে আসে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ কালপর্বে। কিন্তু এরপরই দলটির গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়।

১৯৭৬ সালে ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে আনে মিউজিক্যাল কমেডি *মুনতাসির* এক সর্বভূক মানুষের আখ্যান। পুরো নাটকটিই সুরে-ছন্দে-সংগীতে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকটির স্যুভেনিওরে সেই অঙ্গীকারই যেন বা ব্যক্ত করে ঢাকা থিয়েটার।

> জাতীয় নাট্যাঙ্গিকের প্রথম নিরীক্ষা 'মুনতাসীর'। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী : মুনতাসীরের অভিনয় রীতি এদেশীয়। এ নাটকের মূল চরিত্র মুনতাসীর। এদেশের প্রচলিত রূপকথার রাক্ষসের পুঁজিবাদী রূপান্তর। আর ভাষা? মুনতাসীরের ভাষা কবির লড়াই–এর ভাষার সমান্তরাল (ঢাকা থিয়েটার, মুনতাসীর ফ্যান্টাসী, স্যুভেনির)।

মুনতাসির মঞ্চায়নের পর তা তুমুল দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশের তৎসময়ের পরিস্থিতির এক ব্যাঙ্গাত্মক উপস্থাপনা ছিল এই নাটক। এ জনপদের ধমণীতে নৃত্য-সংগীত ও তালের যে ঐকতান আবহমানকাল ধরে প্রবাহিত, মুনতাসির নাট্যের রচনাশৈলী ও নির্দেশনাকাণ্ডে তার প্রতিধ্বনি মেলে।

> মুনতাসীর নাটকে ইউরোপীয় অঙ্ক বিভাজন পরিত্যাক্ত হয়েছে। নাট্যদৃশ্য কোন প্রথাগত দৃশ্য বিভাজনরীতিরও অনুগামী নয়। কিন্তু নাট্যকারের নির্দেশনা দৃষ্টে দৃশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় অনায়াসে। দৃশ্য পরিবর্তনকালে প্লাকার্টধারী সঙ–এর উপস্থিতির মধ্যে ব্রেখটিয় নাট্যরীতির অনুসরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সংবাদ কার্টুনের দোসর মুনতাসীর নাটক যে বিশেষ তাল ও সুরে বাঁধা তা বঙ্গদেশীয় (রহমান, ২০০৯, পৃ. ৪৫)।

১৯৭৭ সালে 'নাচাও রাস্তা নাচাও' স্লোগানে *চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টারি* নামের নাটক রাস্তায় প্রদর্শন করে নিয়মিত পথনাটকের চর্চার যে সূচনা করে ঢাকা থিয়েটার তা আজ একটি স্বতন্ত্র নাট্য আঙ্গিক রূপে প্রতিষ্ঠিত। এখন যে কোনো স্বৈরশাসন কিংবা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে শিল্পিত প্রতিবাদ মানেই পথনাটক। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পথনাটক কী বিপুল ভূমিকা রেখেছিল তা বিস্মৃত হওয়ার নয়। *মুনতাসির* থেকে যে যাত্রা শুরু হয় জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের পথে, *চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টারি*তে তার প্রায়োগিক নীরিক্ষা অর্থাৎ বর্ণনাধর্মিতা লভ্য। কেননা পরবর্তীতে দেখা যায়, বর্ণনাত্মক নাট্যকেই জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের রূপ বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

> 'মুনতাসীর'–এই নামের গীতিরঙ্গ নাটকটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃশ্যপট সৃষ্টির ব্যাপারটি একটি মাত্র মঞ্চদৃশ্যে সাধারণীকৃত হয়েছিল। পরের নাটকটি ছিল শকুন্তলা। তাতে আমরা 'নাটক' কথাটির পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলাম 'দৃশ্যকাব্য'। 'রাস্তা নাচাও' আন্দোলনের নাটক 'চর কাঁকড়ায়' সচেতনভাবে বর্ণনাত্মক ভঙ্গির প্রয়োগ করি। (নাসির উদ্দীন ইউসুফ সে নাটকে গদ্য সংলাপের পটভূমিতে ঢোলের ব্যবহার করেছিলেন।) চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টারী মুখ্যত আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছিল। এভাবে দৃশ্য, মঞ্চ, ভঙ্গি ও ভাষাবিষয়ক ভাবনা থেকে আমরা খুব সচেতনভাবে উৎসপ্রবণ হয়ে উঠি (আল দীন, ১৯৮৬, পৃ. ২২৭)।

তৎসময়ে প্রকাশিত তিমূর ইউসুফকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নাটকটির নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন–

> সাহিত্য মূল্য ছাড়া নাটক পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তাই ঢাকা থিয়েটার নাটক মঞ্চায়নের সাথে সাথে নাট্য সাহিত্যের চর্চাকেও গুরুত্ব দেয়। আমাদের এখনকার নাটকগুলোতে আমরা পূর্ব বঙ্গীয় ভাষাকে ব্যবহার করছি। নিজস্ব নাট্যসাহিত্য একটি জাতিকে অনেকখানি এগিয়ে নিতে পারে।

অর্থাৎ নাটক মঞ্চায়নের ঢাকা থিয়েটার সীমাবদ্ধ থাকতে চায়নি। তারা নাটকের সাহিত্যমূল্য নিয়েও সমান সজাগ ছিল। সাধারণ অর্থে ধরে নেয়া যায়, নাটক মানেই দেখনদারির বিষয়, পাঠের নয়। কিন্তু এই অর্থজ্ঞাপকতায় না থেকে নাট্য সাহিত্য বিষয়ে ঢাকা থিয়েটারের উপলব্ধি পরবর্তীতে বাংলা নাটকের গবেষণা ও রচনাশৈলীতে প্রভাব ফেলে।

এ কালপর্বেই হাবিবুল হাসানের *কসাই*, বাস্তববাদী নাটকে আঙ্গিক অন্বেষণের চেষ্টা। কিন্তু এরপরই ঢাকা থিয়েটার সাজেদুল আউয়ালের *ফণিমনসা* নাটকের মঞ্চায়নে প্রসেনিয়াম ছাড়িয়ে আরো সম্মুখতল ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত তৈরি করে তাই কালক্রমে দলটির ঐতিহ্যনিষ্ঠ নাট্যভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে যায়। সমসময়েই দলটি নাটকের বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক বিনির্মাণে পুরাণ ভাবনাকে আপন করে নেয়। *শকুন্তলা* নাটকের মঞ্চায়নে তাই ঢাকা থিয়েটারের দৃপ্ত উচ্চারণ–

> পুরাণ নির্মাণের দৃষ্টান্ত বাংলা কাব্যে যতোটা আছে– বাংলা নাটকে ততোটা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা নাটকে পুরাণ এসেছে ধর্মীয় আবেগ থেকে। স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনের দৃষ্টান্ত শকুন্তলা কিভাবে হতে পারে। যার জন্ম বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গের ফলে স্বর্গ-মর্ত্যের বিরোধভূমিতে– তার জীবন দ্বন্দ্বহীন গল্প হয় কি করে (আল দীন, ১৯৮৬, পৃ. ২২৫)।

'জাতীয় নাট্য আঙ্গিক' নির্মাণের পথযাত্রায় ঢাকা থিয়েটার ও সেলিম আল দীন প্রায় সমার্থকরূপে অগ্রসর হয়েছেন। সেলিম আল দীনের রচনায় বাংলা নাটকের প্রকৃত সুর বেজে ওঠার আগমণধ্বনি প্রথম টের পাওয়া যায় এই *শকুন্তলা* নাটকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্যকে আমলে নেয়া যেতে পারে–

> সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার এবং সেলিম আল দীন রচিত শকুন্তলা নাটকের সূত্রধারের মধ্যকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে এমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, শেষোক্ত নাট্যকার সূত্রধার চরিত্র নিয়ে নীরিক্ষায় অবতীর্ণ। এবং সেলিম আল দীন সূত্রধারকে গল্প কথক রূপে দেখতে অভিলাষী। তাঁর নাটকের সূত্রধার প্রকৃত প্রস্তাবে ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাটকের আদলে সৃষ্ট। সে কথক, দর্শক- শ্রোতাকে গল্প শোনানো এবং দেখানো তার দায়িত্ব। এ পর্বেও নীরিক্ষার ফল তাঁর পরবর্তী কথানাট্য শ্রেণীর নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায় (রহমান, ২০০৯, পৃ. ৫১)।

জাতীয় নাট্য আঙ্গিক বিষয়টি ধরতে হলে আগে জাতি সম্পর্কে খানিক ধারণা পেশ করা জরুরি। জাতি সম্পর্কে এক ভাষণে ফরাসি প্রাচ্যবিদ জোসেফ আর্নেস্ট রেনান বলেছেন–

> জাতি হল একটি জীবন, একটি আধ্যাত্মিক উপাদান। জাতি ধারণায় দুইটি বিষয় নিহিত। একটি হল অতীত, যা সাধারণভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত সমৃদ্ধ গৌরবকে নির্দেশ করে এবং অপরটি হল বর্তমান, যা একত্রে দিন যাপন, বসবাস, ঐতিহ্য সচেতনতা ইত্যাদি নির্দেশ করে। জাতি হল অনেকটা সত্তার মত, এটি পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ বিসর্জন এবং অবদানের সমন্বিত রূপ। একটি সমৃদ্ধ অতীত, বিখ্যাত ব্যক্তি, গৌরব প্রভৃতি হল জাতীয় ধারণার সামাজিক মূলধনের ভিত্তিস্বরূপ। একই অতীত গৌরব এবং বর্তমানে একত্রে বড় কিছু করার ইচ্ছাই হল সমন্বিত জনগণ হবার প্রয়োজনীয় শর্ত (হাসান, ২০১৮, পৃ. ১৯)।

জাতি সম্পর্কে জটিল আলোচনায় না গিয়ে শুধু রেনানের দেয়া সংজ্ঞাকে আমলে নিলে দেখা যায়, সেলিম আল দীন ও ঢাকা থিয়েটার মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই মূলত বাংলানাট্যের সাহিত্যিক ও পরিবেশনার সূত্রসমূহ সন্ধান করেছে, যা সমৃদ্ধ অতীতে পূর্বপুরুষদের যে অবদান তাকে নতুন করে তুলে আনার বিষয়কে নির্দেশ করে এবং এরমধ্য দিয়েই জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের মতো একটি বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। একই সঙ্গে তা এই ভূখণ্ডের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রামাণ্যও বটে। কিন্তু কেন তা অবধারিত হয়ে ওঠে? ফরাসি-আলজেরীয় চিন্তাবিদ ফ্রাঞ্জ ফানো'র কথায় এর সমাধান খোঁজা যেতে পারে।

> জাতীয় সংস্কৃতির অতীত অস্তিত্বের দাবি শুধুমাত্র সেই জাতিকে পুনর্বাসিতই করে না, ভবিষ্যৎ জাতীয় সংস্কৃতির আশাবাদের যৌক্তিকতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে না, মানসিক

> ভারসাম্যের স্তরে তা ভূমিপুত্রের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও আনয়ন করে (ফানো, ২০০৬, পৃ. ১৫২)।

জাতীয় সংস্কৃতিতে এই বৃহত্তর পরিবর্তন আনা এবং জাতির মানসকে উপনিবেশের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করার এক সুমহান ইচ্ছাই ঢাকা থিয়েটার ও সেলিম আল দীনকে চালিত করেছে জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের পথে।

ইতোমধ্যে সেলিম আল দীনের নেতৃত্বে ঢাকা থিয়েটার জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের সূত্রসমূহ আবিষ্কারের লক্ষ্যে প্রান্তিক সমাজে পরিবেশিত বিভিন্ন নাট্যমূলক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা শুরু করে।

> লক্ষ্য অর্জনে তিনি (সেলিম আল দীন) শেকড়ের সন্ধানে অভিগমন করলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলো বাঙালির জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের বিচিত্র রূপের সংস্পর্শে এসে। বুদ্ধনাটক, লীলানাট, ডঙ্ক, নাটগীত, গীতনাট, মঙ্গলনাট, হাস্তর, জারী, সঙ, তামাশা, লেটো, ঘাটু, অষ্টক, পালা, গীতিকা, আলকাপ, গম্ভীরা, পাঁচালি ইত্যাদি নাট্য আঙ্গিক আবহমান বাঙালির শিল্পরস পিপাসা নিবৃত্ত করেছে হাজার বছর। উক্ত আঙ্গিক সমূহের উৎপত্তির সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ কান্না-হাসি আনন্দ- বেদনার রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। কেননা উক্ত আঙ্গিকসমূহের স্রষ্টা তাঁরাই। তারাই একে প্রচার ও সংরক্ষণ করে আসছেন। উক্ত প্রকরণে উপজীব্য বস্তু তাদের সাফল্য-ব্যর্থতারই ইতিবৃত্ত। তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্কেও জটিল রূপটি স্বকালের রচয়িতার চিন্তন সংশ্লিষ্টতায় আত্মপ্রকাশ করেছে এসব আঙ্গিকের আশ্রয়ে। বাঙালির আত্মপরিচয়ের দলিল বিধায় এগুলো আমাদের জাতীয় নাট্য আঙ্গিক। বিষয় যা'ই হোক, পরিবেশনাগত বিচাওে উপর্যুক্ত আঙ্গিক পাঁচালি রীতির। আচার্য সেলিম আল দীন উপরোক্ত নাট্য আঙ্গিকের অঙ্গ সংস্থানদৃষ্টে জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের প্রকৃত কাঠামোটি আবিষ্কার করেন (রহমান, ২০১৯, পৃ. ২১৭) যার সঙ্গী হয় ঢাকা থিয়েটার।

লক্ষ করা যায়, সেই আবিষ্কার শুধুমাত্র চিন্তন ও যুক্তিতর্কের ঘেরাপোটে আবদ্ধ থাকে না। সেলিম আল দীন রচনা করেন দীর্ঘায়তনের কাহিনিবহুল নাটক 'কিত্তনখোলা'। ঢাকা থিয়েটারের আত্মানুসন্ধানের প্রথম ইশারা এই 'কিত্তনখোলা'। দীর্ঘায়তনের, ঘটনাবহুল আর অসংখ্য চরিত্রের সমাহারে রচিত হয় 'কিত্তনখোলা'। সংলাপাত্মক ধারা অক্ষুণ্ন থাকলেও বাংলার লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির নানা দিক উঠে এসেছে এক মহাকাব্যিক বিস্তারে। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যরীতির প্রেরণাজাত 'কিত্তনখোলা' নাটকে দৃশ্যের পরিবর্তে সর্গ বিভাজন এসেছে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা নিয়ে। পাশ্চাত্য নাটকের সুতীব্র ঘটনাপ্রবাহের বদলে এ নাটকে এদেশের আখ্যান কাব্যের চিরায়ত বর্ণনাত্মক রীতিটি নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নাটকের বিষয়ে এদেশের শ্রমজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক জীবন ভাবনাও একীভূত। জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের প্রথমপর্বে কিত্তনখোলা ধ্রুপদি বাস্তবতার প্রথম নাটক।

> মোট কথা একটি আদ্যন্ত কাহিনী নয়, বরং প্রাত্যহিক ঘটমান খন্ড খন্ড কতগুলো দৃশ্যে একটি চিরায়ত গল্প কাঠামোর অন্তর্ঘূঢ় সত্যেও বিন্যাসই এই নাটকের বিশিষ্টতা। ফলে নাটকের প্রথাগত চলতি পরিসর ভেঙে গেছে। এবং পাশ্চাত্য নাটকের সুতীব্র ঘটনাবৃত্তের বদলে এ নাটকের এদেশের মঙ্গলকাব্য কিংবা অন্যান্য কাহিনী কাব্যের চিরায়ত বর্ণনাত্মক রীতিটি নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৭৪)।

লক্ষ করা যায়, ইতোমধ্যে সেলিম আল দীন বর্ণনাত্মক রীতিতে নাটক রচনার সূত্র ছুঁয়ে ফেলেছেন, ঢাকা থিয়েটার অভিনয়রীতি ও প্রয়োগ কৌশলে সেটি বাস্তবায়নের পথে।

> কাহিনীর বিশালতা ও সংলাপের বর্ণনাধর্মিতার কারণে নাটকের প্রায় কোথাও চরম নাট্যিক উত্তেজনা দেখা যায় না। সংলাপের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত বলে দর্শকের কাছে ঘটনার আপাতত গতিময়তার চাইতে কথকতার চিত্রময় দৃশ্যমানতা মুখ্য হয়ে ওঠে। পুরো কিত্তনখোলা নাটকটি বর্ণনাত্মক রীতিতে লেখা (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৭৫)।

সেখানেই না থেকে তিনি আরো বলেন–

> কিত্তনখোলা নাটক আঞ্চলিক কথ্যভাষায় রচিত। সমসাময়িক নাট্যধারায় আঞ্চলিক ভাষারীতির স্বকীয়তা ও এর অন্তর্নিহিত প্রাণস্পন্দন সেলিম আল দীনের মত আর কোন নাট্যকার পরিস্ফূটিত করতে পারেননি বলে অত্যুক্তি হবেনা। তিনি আমাদের হাজার বছরের নাট্য ইতিহাসের অমিয়ধারা মন্থন করে তৈরী করেছেন তাঁর ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৭৫)।

অভিনয় প্রসঙ্গে একই সমালোচক মন্তব্য করেন–

> এই নাটকে যে অভিনয়রীতি গড়ে উঠেছে তার সম্পূর্ণতই প্রাচ্য অভিনয়রীতি। প্রাচ্যদেশীয় অভিনয়রীতি মূলতঃ গীতল বা কাব্যিক (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৭৭)।

কিত্তনখোলা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> কিত্তনখোলা নাটকটির মূল চরিত্র সোনাইর ভূমিকায় পিয়ারের অনুপম অভিনয়রীতির বেশিরভাগই প্রাচীন বাংলার বর্ণনাত্মক রীতির সাথে সম্পর্কিত (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৭৮)।

যে কারণে দলটির প্রয়োগকৃত অভিনয়শৈলীকে দেশীয় ঐতিহ্যের সংলগ্ন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন সমালোচক–

> ঢাকা থিয়েটার ইউরোপীয় নাটকের ক্ষিপ্রতার বদলে চিত্রল ও বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির প্রয়োগ করেছে (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৮৪)।

তবে এতোটুকুতেই তৃপ্ত না হয়ে আরো বৃহত্তর পরিসরে বিষয়টি নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি সারাদেশে তা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে ঢাকা থিয়েটার। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

> ঢাকা থিয়েটারের তত্ত্বাবধানে ৬ মাঘ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ২০ জানুয়ারি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ সালে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার তালুকনগর গ্রামে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সেলিম আল দীন ও নাসির উদ্দীন ইউসুফ। স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন। তালুকনগর গ্রামের শাহ আজহার ওরফে আজাহার বয়াতীর মাঘীমেলাকে কেন্দ্র করে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা থিয়েটার মৌলিক নাটক মঞ্চায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সেলিম আল দীন মানিকগঞ্জের সংস্কৃতি দেখে নিজের নাটক রচনার নতুন পথ খুঁজে পান। তাঁর রচিত কিত্তনখোলা'র পটভূমি মানিকগঞ্জ। কিত্তনখোলা নাটকের মনাই বয়াতী মূলত শাহ আজহার। শাহ আজহারের মেলার হাল অবস্থার সাথে নিজের কল্পনা মিশিয়ে নাটকটি রচনা করেন সেলিম আল দীন। ১৯৮২ সালে সেলিম আল দীনের রচনায় ও নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর নির্দেশনায় ঢাকা থিয়েটার তালুকনগরে মঞ্চায়ন করে 'সায়ফুলমূলুকের দইরা যাত্রা' নামক নাটক। ১৯৮৩ সালে গড়ে ওঠে গ্রাম থিয়েটারের প্রথম সংগঠন 'তালুকনগর থিয়েটার'। সে বছর তালুকনগর থিয়েটার চৌকোণা খোলা মঞ্চে মঞ্চায়ন করে 'চোর' নাটক ও ঢাকা থিয়েটার মঞ্চায়ন করে সেলিম আল দীনের রচনায় ও নাসির উদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনায় 'বাসন'।

> দ্রুতই একে একে গড়ে ওঠে বংশাই থিয়েটার, গৌরাঙ্গী থিয়েটারসহ শতাধিক সংগঠন। শুরু থেকেই গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল বোধন-কুষ্টিয়া, বগুড়া থিয়েটার, সংলাপ-ফেনী প্রমুখ নাটকের দল। জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার। এই আকাঙ্ক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চৌকোণা খোলা মঞ্চ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়। এই মঞ্চ যাত্রার মঞ্চের মতই তবে এতে এক দিকের পরিবর্তে চার দিকে প্রবেশ ও নির্গমনের পথ থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি ও বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি উদ্ভাবন করে ঢাকা থিয়েটার ও বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার। গ্রাম থিয়েটারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঐতিহ্যবাহী (লোক) সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য কাজ করা (বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ওয়েবসাইট)।

পাশাপাশি বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের ঘোষণাপত্রে বলা হয় :

> পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিতাস ও অশান্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে আমাদের বাস। শত শত বছরের ইতিহাস ও ভৌগলিক পরিমণ্ডলে আমরা বেড়ে উঠেছি। সহস্র বছর ধরে শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। মুক্তিযুদ্ধেও সুমহান আদর্শে আমরা উজ্জীবিত। তাই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠন কিংবা কর্মকাণ্ডে জড়িত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার–এর কোনো সদস্য সংগঠন কিংবা ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না। বাংলাদেশের মঞ্চে আমরা আমাদের নিজেদের জীবন পরিমণ্ডল ও লড়াই–এর চিত্র তুলে ধরতে চাই। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার মেরুদণ্ডহীন আপোষকামী নাট্যচর্চার বিরুদ্ধে প্রাণবন্ত ও প্রাণদায়ী নাট্যচর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।
>
> সাংস্কৃতিক ভিক্ষাবৃত্তি ও লেজুড়বৃত্তি তথা উৎকেন্দ্রিকতাকে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার তীব্র ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করে। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনে বদ্ধপরিকর।
>
> বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার শহর কেন্দ্রিক নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে নাটকের দল গঠন ও মেলা পত্তনে দৃঢ় ভাবে সংকল্পবদ্ধ। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার শুধু জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে ব্যাখ্যাই করবে না তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সচল ও উপযুক্ত করে তুলতে বদ্ধপরিকর।
>
> বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার বাংলাদেশের মঞ্চে, চিত্রকলায়, সঙ্গীত, কাব্যে অর্থাৎ তাবৎ শিল্প ও সাহিত্যকর্মে এদেশের জনগণ এবং জনপদেও সংস্কৃতি এবং অবহেলিত আঞ্চলিক ভাষারীতির উজ্জীবন ঘটাতে চায় (বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ওয়েবসাইট)।

একালপর্বে এসে ঢাকা থিয়েটারের নাটকের আঙ্গিক বদলে যায়। অনতিকাল পূর্বে *বায়ান্নের শকুন* নামে একটি নাটক মঞ্চায়ন করে। কিন্তু ইতোমধ্যে পশ্চিমা ক্লিশে অঙ্ক বিভাজরীতি থেকে সরে গেল ঢাকা থিয়েটারের নাটক। তাই স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা থিয়েটারের সামগ্রিক মঞ্চায়ন শৈলী বদলে গেল।

এই সময়ে ঢাকা থিয়েটার নাট্যমঞ্চায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রকাশবাদের শৈলী গ্রহণ করেছে বাংলা নাটকের বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির প্রেক্ষাপটে। দেখা যায় নাটকের দৃশ্য বিভাজনের বদলে বৃত্ত পরিকল্পনা, খণ্ডে বিভাজন, পাশ্চাত্যের ঘটনা সংঘাতের রীতি থেকে সরিয়ে একটি আলাদা অবয়ব দিয়েছে এবং সেটি শুধুমাত্র লেখ্য মাধ্যমে নয়, উপস্থাপনাতেও এনেছে অভিনবত্ব। নাটক *কেরামতমঙ্গল*। মহাকাব্যিক বিস্তারে ধ্রুপদি বাস্তবতার দ্বিতীয় প্রযোজনা।

> কেরামতমঙ্গল নাটকের কাহিনী ভাষা এবং প্রতীক নির্মাণ কখনই লোকজ জীবন বিচ্ছিন্ন নয়। ফলে বাংলা নাটকের বিশ্বস্পর্শী সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এই নাটক। ঢাকা

> থিয়েটার জাতীয় নাট্য আঙ্গিক তত্ত্বের বিকাশের জন্য যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কেরামতমঙ্গল নাটকের কাহিনী তার সামঞ্জস্য রেখায় অবস্থিত (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৯০)।

জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢাকা থিয়েটারের অঙ্গীকার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে খানিকটা ধরা পড়ে *কিত্তনখোলা* নাটকে। *কেরামতমঙ্গল* নাট্য নির্মাণে সে পথে আরো অগ্রসর হয় দলটি। কারণ–

> ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত কেরামতমঙ্গল নাটকে জাতীয় জীবনের একটি সামগ্রিক রূপই শুধু ধরা পড়েনি, ঐতিহ্যের সচেতন প্রয়োগে দলীয় চিন্তাধারার সাযুজ্য স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের নাটক যদি বিশ্ব নাট্যমঞ্চে কোন ভূমিকা রাখতে চায় তার জন্য প্রয়োজন জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের ব্যবহার। প্রায় অনেক দেশেই নিজস্ব একটি নাট্যরীতি রয়েছে। গ্রীক নাট্যরীতি, এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডের নাট্যরীতি, জাপানের 'নো' এবং 'কাবুকী' থিয়েটার। [...] কাজেই আমরা যে জাতীয় নাট্যরীতির কথা বলতে চাই তাতে প্রতিফলিত হবে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপ। যে রীতির বিশিষ্টতায় বাংলাদেশের নাটক বিশ্বের অন্যান্য নাট্য আঙ্গিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হবে। কেরামতমঙ্গল দর্শনে তাই বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য আঙ্গিক সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায় (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ৯৭)।

কিন্তু শুধু নাটক রচনা, অভিনয় ও প্রয়োগেই ঢাকা থিয়েটার স্থির থাকেনি। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার প্রতিষ্ঠা, গ্রামে গ্রামে মেলা পত্তন এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের নমুনা নিয়ে 'জাতীয় নাট্য আঙ্গিক' দাবি যে বাস্তবসম্মত তা প্রমাণেও সচেষ্ট ছিল দলটি। যে কারণে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের আয়োজনে 'জাতীয় নাট্য আঙ্গিক' প্রতিষ্ঠায় আনুষ্ঠানিক প্রকল্পও গ্রহণ করে–

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার

ঢাকা থিয়েটার পরিচালিত "জাতীয় নাট্য আঙ্গিক প্রকল্প"

প্রযোজনা–৩

গাজীর গান:

জামাল কামালের পালা

পরিবেশনা : জামশা থিয়েটার

প্রসঙ্গ কথা:

> ১৩৯৩ সালে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার কেন্দ্রীয় পরিষদের দ্বিতীয় সভায় বাংলাদেশের কৃষি জীবনে প্রচলিত নাটক ও নাট্য আঙ্গিকের মধ্যযুগীয় যেসব অবশীর্ণ নমুনা এখনও বিদ্যমান, সেসব নাটক ও নাট্য আঙ্গিকের সংরক্ষণ, সংস্কারের একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে গাজীর গান ও হাস্তর নাটক নিয়ে কাজ শুরু হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিলো মঞ্চে সুদীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকা থিয়েটার যে জাতীয় নাট্যরীতির কথা বলছে তার প্রমাণসিদ্ধ রূপটি আধুনিককালের আত্ম-বিস্মৃত নাট্য দর্শক ও নাট্য সমালোচকদের সামনে তুলে ধরা। এরফলে জাতীয় নাট্যরীতি সম্পর্কে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার ও ঢাকা থিয়েটারের বক্তব্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াবে। ইংরেজ আমল থেকেই বাংলা নাটকের উদ্ভব এমন বিশ্বাস উন্মুলিত হবে। মধ্যযুগের বাংলা নাটকের লুপ্ত নমুনা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য ও নাট্য গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষিত হবে।
>
> সহৃদয় দর্শক ও নাট্য সমালোচকরা আশা করি বিস্মৃত হননি যে মিউজিক্যাল কমেডি মুনতাসীরের দেশীয় রীতির গীত ও ভাষা কাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। তারপর ক্রমাগত চর কাঁকড়া (এদেশের প্রথম রাস্তার নাটক), শকুন্তলা, কিত্তনখোলা, কেরামত মঙ্গল প্রভৃতি নাটকের মধ্যদিয়ে

আমাদের সম্পর্ক বহু বিচিত্র বিভায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে আমাদের নাট্যদর্শন। বক্ষ্যমান প্রযোজনা গাজীরগান : জামাল কামালের পালার মাধ্যমে আমরা নতুন করে মৌখিকরীতি উজ্জীবনের সম্ভাবনাও পরীক্ষা করছি। কেননা বাংলাদেশের নিরন্ন ও নিরক্ষর মানুষের মধ্যে দ্রুত জীবন সম্পর্কে সমকালীন অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করার ব্যাপারে এই মৌখিকরীতির নাটক অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। উপরন্তু গভীর জীবনচেতনা বিচিত্র অনুভবও কৌশলে এরমধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব। হাজার বছরের বাংলা নাটকের বর্ণনাধর্মী আঙ্গিক এমত শক্তিশালী যে পৃথিবীর যেকোন মহৎ শিল্পকর্মকে এই বর্ণনাধর্মী রীতির মধ্যে রূপান্তরিত করা যাবে বলে আমরা দৃঢ় মত পোষন করি।

মৌখিক রীতির আধুনিক বিকাশের সম্ভাব্যতা নীরিক্ষণের জন্য ঢাকা থিয়েটার ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আশাকরি ১৩৯৪ সালের মধ্যে আমরা আরো তিনটি মধ্যযুগীয় নাট্য বিষয়ের সঙ্গে কমপক্ষে একটি নাটক মৌখিকভাবে রচনা করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হব। গাজীর গান মঙ্গলকাব্য রীতির নাটক। এই নাট্য রীতি একান্তভাবেই মুসলমানদের তৈরী। কিছুদিন আগে একজন প্রথিতযশা বাংলাদেশী লেখক একটি নিবন্ধে মুসলমানদের নাট্যচর্চার কোন ইতিহাস নেই বলে গ্রামাঞ্চলে নাটকের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। আশা করি তিন থেকে চারশ বছর ধরে প্রচলিত গাজীর নাটক দেখে এই ধরনের অপরিপক্ষ ধারণার অবসান ঘটবে। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা মাত্রই নাটক। এইসব গীতিকার অধিকাংশ রচয়িতা ও অভিনেতারা হচ্ছেন মুসলমান।

গাজীর গানের সমান্তরাল হচ্ছে রায়মঙ্গল কাব্য। রায়মঙ্গলে একজন কবি কৃষ্ণরাম ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন। খুলনা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসারের কালে দক্ষিণা রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গাজী পীর তদীয় সহচর কালুর আবির্ভাব।

গাজীর গান এই শিরোনামে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধরণের কাহিনী প্রচলিত আছে। জামাল কামালের পালা তার মধ্যে একটি। দক্ষিণা রায়ের প্রতিদ্বন্ধী হিসাবে আবির্ভূত হলেও গাজীর গানে সম্পূর্ণতঃ অসাম্প্রদায়িক চেতনা লক্ষ্য করা যায়। এমন কি এই অসাম্প্রদায়িকতা অনেকাংশে সমন্বয়ধর্মী। তালুকনগরের আজাহার বয়াতির দ্বিতীয় মাঘী মেলায় এই গানের অভিনেতার পোষাক ছিলে যথাক্রমে ধুতি আচকান ও টুপী। মূলতঃ গল্পের কারণে বক্ষমান জামাল কামালের পালা স্থানে স্থানে সংস্কৃত হয়েছে। মূল পালাটি ছিলো আট থেকে দশ ঘণ্টার। আমরা কাহিনী কোন তুচ্ছতম অংশ বাদ না দিয়ে অবিরল বর্ণনাকে খানিকটা কমিয়ে দিয়েছি। সুর কোথাও বিকৃত হয়নি। এই নাটকের অভিনেতারা সকলেই জামশা থিয়েটারের সদস্য। বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা আগে ভেল্কীবাজী করতেন, কমলা সুন্দরী প্রভৃতি নাটকের অভিনেতারাও ছিলেন এরা। প্রধান অভিনেতা জনাব মোঃ হাকিম আলীর বয়স বাষট্টি। সহ অভিনেতা মোঃ শুকুকুর আলীর বয়স আশি। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এরা গাজীর গানে অভিনয় করছেন।

জামাল কামালের পালায় অবিরল সমুদ্র বর্ণনা ও বাণিজ্য প্রসঙ্গ আছে। এই মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সমুদ্র কল্লোল বেজে উঠুক এই অপরিসর মঞ্চে, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমাদের কালের লেখক পাঠক ও শ্রোতা দর্শকদের উন্মুল অন্তর ফিরে আসুক চিরায়ত বাঙালী জীবনের উৎস মূলে।

ঢাকা থিয়েটার পরিচালিত “জাতীয় নাট্য আঙ্গিক প্রকল্প”
প্রকল্প পরিচালক : নাসিরউদ্দিন ইউসুফ
সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার
স্মরণিকা সম্পাদনা : সালাম সাকলাইন, কৌশিক সাহা (গ্রাম থিয়েটার, ১৯৮৬, স্মরণিকা)

এরপর ঢাকা থিয়েটার যেন তার গন্তব্যের ইশারা সুনির্দিষ্ট করার পথে অগ্রসর হয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত মহাকাব্যিক বিস্তারে রচিত তৃতীয় নাটক *হাতহদাই*–এর মধ্যদিয়ে। নোয়াখালীর সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষের জীবন ও সংগ্রামগাথাই যেন উঠে এসেছে অভিন্ন ছন্দে। *হাতহদাই* নাটকের অঙ্ক বিভাজন প্রচলিত নাট্যরীতির নয়। সমুদ্রোপকূলীয় জীবনের গল্প সমুদ্রের জোয়ার ভাটার মতোই। এই জোয়ার ভাটার অনুকরণে নাট্যপর্ব বিভাজিত হয়েছে। নাটকে এমত নিরীক্ষা কখনও হয়নি যে সমুদ্রের জোয়ারভাটা, মহাকাব্যের সর্গ বিভাজন কিংবা দোজখের বৃত্ত পরিকল্পনায় নাটকের দৃশ্য বিভাজন হতে পারে। শুধু যে আঙ্গিক গঠনেই নিরীক্ষা চালু ছিল তা নয়, অভিনয়রীতির দেশজধারার পুনঃসৃজনের বিষয়টিতেও গভীর মনযোগ ছিল এবং অভিনয়শৈলী প্রাচ্য দেশীয় অভিনয় রীতির গীতল ও কাব্যিক বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করেছে। চরিত্র ও বর্ণনাকারীর অভেদাত্মক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। নাটকে প্রাণীকূলও চরিত্ররূপে উঠে আসতে পারে বাংলা নাটকে তার প্রথম আভাস। যে জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা থিয়েটারের নিরন্তর সংগ্রাম, *হাতহদাই* এ এসে যেন তারই কূলে ভিড়তে যাচ্ছে তরী। এ প্রসঙ্গে সেলিম আল দীনের বক্তব্য থেকে পরবর্তীতে বর্ণনাত্মক বাংলা নাটকের যে সূচনা তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

> ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য বা সংস্কৃত নাট্যের পন্থায় চরিত্রের নাম বামে বসিয়ে ডানে সংলাপ স্থাপনের আদ্যিকেলে রাম-সীতার উপবেশন রীতিটাও পরিত্যাগ করবার বাসনা আছে (আল দীন, ১৯৯৭, ভূমিকা)।

অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত নাট্যরীতির বাইরে নিজস্বরীতি নির্মাণের দিকে অগ্রসর হওয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেন যার সঙ্গী হয় ঢাকা থিয়েটার। ফলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ঢাকা থিয়েটারের রীতি বদলে যেতে থাকে। অভিনয়ে আসে একই সঙ্গে সংলাপ ও বর্ণনা দানের অভিন্ন প্রয়াস।

> হাতহদাই নাটকের চরিত্রের মূল প্রবণতা থেকে তৈরী হয়েছে এর অভিনয় রীতি। এছাড়া প্রাচ্য দেশীয় অভিনয় রীতির গীতল ও কাব্যিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে হাতহদাই নাটকের অভিনয়ে (আহমদ, ১৯৯২, পৃ. ১০৬)।

উপস্থাপনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই–

> সর্গের বন্ধনে রচিত কিত্তনখোলার অন্তর্গত স্বভাব বর্ণনাত্মক অর্থাৎ নৃত্য-গীত-কথা-কথকতা নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আশ্রয়ে আসরে আসরে পরিবেশনযোগ্য। বাঙালির আসরকেন্দ্রিক নাট্যসাধনার সকল বৈশিষ্ট্য কিত্তনখোলায় বিদ্যামান। জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এর চরিত্র–চরিত্রের গীতলরূপ ও মানসভঙ্গিও অভ্যন্তরে বাঙালির চিরায়ত স্বপ্ন কল্পনা, সমাজ সম্পর্কেও সহজিয়া ঢংটি অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ধ্রুপদী শিল্পের শালীনতা বা শুদ্ধতা, ভাষা ভাব অলঙ্কারের নান্দনিক সাম্য, বাস্তব সত্য ও আপাত সত্যেও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের জাতীয় আঙ্গিকের রূপরেখাটি নির্ণয় করেন উল্লিখিত নাটকে। কথিত 'নাট্য-আঙ্গিকে'র উক্ত নিরীক্ষা সমাপ্তির পর তিনি আঙ্গিকটিকে সকলের নিকট সহজবোধ্য করবার লক্ষ্যে 'কেরামত মঙ্গল', 'হাত হদাই' রচনা করেন। বলাবাহুল্য পূর্বোক্তি নাটকসমূহ জাতীয় 'নাট্য-আঙ্গিকে'র স্বাক্ষরবাহী। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচিত্র বিষয়ের বাহন নাট্য-বিষয় যে আধারে উপস্থাপিত হয়েছে তা'ও কোন বাঙালির নিকট অপরিজ্ঞাত নয়। 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গলে'র আসরের নাম 'মনসার ভাসান, 'মনসার কথা, 'কান্দনী বিষহরি, 'রয়ানি, 'বেইলা নাচাড়ি, 'চণ্ডীর গানে' রাতের পর রাত বাংলাদেশের মানুষ হাজার বছর এই আঙ্গিকের পরিবেশনাই দেখেছেন, আজও দেখেন। জাতির পরিচয় জ্ঞাপক যেকোনো বস্তুই জাতীয় মর্যাদার দাবীদার – এই সহজ যুক্তিতেই বলা সঙ্গত যে, সেলিম আল দীন

প্রতিষ্ঠিত নাট্য-আঙ্গিক অবশ্যই আধুনিক বাংলা নাট্যের জাতীয় নাট্য-আঙ্গিক (রহমান, ২০০৯, পৃ. ২১৮)।

কিত্তনখোলা, *কেরামতমঙ্গল* ও *হাতহদাই*-এর মধ্যদিয়ে বাঙালির নতুন আঙ্গিক ধ্রুপদি বাস্তবতার বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির উদ্ভাবনে তৃপ্ত নয় সেলিম আল দীন ও ঢাকা থিয়েটার; তারা থেমে থাকেনি এবং অচিরেই তারা পেয়ে যায় নতুন নাট্যাঙ্গিক, 'কথানাট্য'। এ ধারায় সেলিম আল দীনের তিনটি রচনা *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন* ও *হরগজ*। 'চাকা' এক অনামা মৃতকে অজানা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার বৃত্তে বাধা। অন্তিম পরিণতিতে অনামা মৃতের গন্তব্য নিশ্চিত হয় অন্ধকার কবর, স্বজন পরিবৃত্ত হয়ে নয়, শ্রমজীবী মানুষের মানবিক হাতে। 'যৈবতী কন্যার মন' এ গীতিকার নারী পরিচয়ে দুইজন্মে দুই নারী মর্ত্যভূমে আবির্ভূত হন। এক নারীর শিল্পী হয়ে ওঠার প্রবল বাসনার অতৃপ্তি বর্ণিত হয় কালিন্দী অংশে অপূর্ণতার বেদনা তাকে আত্মহননে প্ররোচিত করে। অতৃপ্ত বাসনার পূর্ণতা চেয়ে পুনর্বার সেই নারী পৃথিবীতে এসে পরী নাম ধারণ করে। কিন্তু শিল্পের ভেতর দিয়ে অবিরত এক অহং বাসা বাধে যা পরীকে পুনর্বার আত্মবিধ্বংসী করে তোলে। *হরগজ* কথানাট্যে প্রত্যক্ষ করি প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের আঘাতে বিধ্বস্ত এক জনপদ। বিপুল অপচয়ের চিহ্ন। 'কথানাট্য' প্রসঙ্গে সেলিম আল দীন বলেন–

> আমি কথার শাসনে নাটক রচনা করেছি, তাই এর নাম দিয়েছি কথানাট্য। গৃহাঙ্গনে কথক যে কিসসা বলেন দোহারদের সঙ্গে এ নাটকের আঙ্গিক পরিকল্পনায় সে রীতির শিক্ষাটা সক্রিয় ছিল। গ্রাম থিয়েটারের কাজে এ দেশের নানান অঞ্চলে যাই বলে এ দেশের শিল্প শস্যক্ষেতের নানান সুগন্ধি ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাই। পূর্ব পুরুষের সমৃদ্ধ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কৃষকের সাহস বাড়ে। নইলে একজন গায়েন আমার হাতের লেখায় সত্তর বাহাত্তর পৃষ্ঠার নাটক গাইবেন এ ধারণা ইউরোপীয় ধাঁচের নাটক থেকে পাবার কথা নয় (আল দীন, ১৯৯১, পৃ. ৪৪)।

প্রকৃতঅর্থেও ঠিক তাই। সৈয়দ শামসুল হক যথার্থই বলেছিলেন–

> সংলাপ নির্ভর নাটক তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয় না, আবার কেবল দেহছন্দ–নাচ–অভিনয় সকল কিছু তাকে এঁটে উঠতে পারে না, উপন্যাসের ধারাবর্ণনাও তার নিকট বলে মনে হয় না, সৃষ্টি–স্থিতি–লয় এবং ব্যক্তি–সমাজ–সংগ্রাম তাকে অবিরাম দুলিয়ে দিতে থাকে ভূত–ভবিষ্যতে, এমত মুহূর্তে আমাদের এই নাট্যকার এক নতুন সাহিত্য মাধ্যম আবিষ্কার করে ফেলেন–কথানাট্য–যা নাটক, কবিতা, নাচ, গীত, উপন্যাস উপকথা ও কথকতার সমাহার (আল দীন, ১৯৯১, পৃ. ০৫)।

স্পষ্ট হতে থাকে, সেলিম আল দীন ও ঢাকা থিয়েটার জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের দ্বারপ্রান্তে প্রায় কিংবা বলা যেতে পারে, এরই মাঝে সেই আদল গঠিত হয়ে গেছে– যা বর্ণনাত্মক নাট্য নামে ইতোমধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত।

> বর্ণনাত্মক বাঙলা নাটকের যে-আঙ্গিক তিনি গড়েন 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল','হাত হদাই', নাটকে,– তার কাঠামো সেলিম আল দীনকে পরিতৃপ্ত করতে পারলো না। বিস্তর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যের অতি সহজ কিন্তু জটিল অপর আঙ্গিক 'কথানাট্য, অবলম্বনে রচনা করেন 'চাকা' নাটক। কথক এখানে আখ্যানের বাহক। একই সাথে পরিবেশকও। ঘটে যাওয়া ঘটনারাজি কিংবা ঘটতে যাচ্ছে এমন সব ঘটনার 'কথামালা, বাঙলা 'কথানাট্য'। কথার-সূত্রে আখ্যান গাঁথা– আখ্যানের 'কথা' চরিত্রদের 'জীবনের কথা; 'ইতিহাসের কথা,'পুরাণের কথা, 'ঐতিহ্যের কথা, 'সংস্কারের কথা, 'সংস্কৃতির কথা, 'গ্রামের কথা, 'নগরের কথা, 'ঘাটের কথা, 'বাটের কথা, 'গানের

> কথা, 'নাচের কথা, বিশ্বাসের কথা, 'হৃদয়ের কথা, 'কথানাট্যে'র কথকতা। 'কথা" মুখ্য হলেও 'কথা 'এ-নাট্যরীতির শেষকথা নয়। এতে আছে কাব্যিক বর্ণনার অপরিমেয় 'চিত্রকথা'। 'পুরাণের কথাই নয়, আছে পুরাণের যথাবিধি প্রয়োগ। সঙ্গীতের অপূর্ব বাণী – সুরের অমিয় ঝর্নাধারা। ইউরোপীয় মহৎ নাটকের নাটকীয়তাও একেবারে অগ্রাহ্য নয়, কথার প্রয়োজনে, আখ্যানের অনিবার্যতায় নাটকীয়তাকেও অঙ্গে ধারণ করে 'কথানাট্য'। নৃত্য এখানে আসরের সামগ্রী নয়–জীবনের অনিবার্য প্রকাশ–কখনও অনুষঙ্গ প্রসঙ্গ কখনও। কৃত্যের আয়োজন বক্ষ্যমাণ নাটকে নৈমিত্তিকতার সূত্রে গাঁথা। দর্শক পাঠক শ্রোতা নাটকের অভ্যন্তরে বাঙালি জাতিসত্তার মৌল প্রবণতাসমূহ অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করবেন তাতে সন্দেহ কি (রহমান, ২০০৯, পৃ. ২১৮)!

এই কালপর্বে ঢাকা থিয়েটার *ধূর্ত উই*, *ভূত*, *এবার শেখার পালা*, *একটি মারমা রূপকথা*, *একাত্তরের পালা*, *মার্চেন্ট অব ভেনিস* শীর্ষক নাটকও মঞ্চায়ন করেছে। এরপরই পাঁচালি আঙ্গিককে আধুনিক মনস্কতায় পুনর্নির্মাণ করে রচিত নাটক *বনপাংশুল* ও *প্রাচ্য*। একালে যার নামকরণ করা হয়েছে নব্যপাঁচালি। ঢাকা থিয়েটার যেনবা সুদীর্ঘকাল এ আঙ্গিকের জন্যই প্রতীক্ষা করেছিল। যে আঙ্গিক বাঙালির, যে আঙ্গিকে হাজার বছরের মানুষের আচরিত জীবনপ্রবাহের অনুকূল, যাতে এক আকাশে বেঁধে ফেলা যায় সর্বকালের সকল সূর্যতারাকে।

মধুপুর অঞ্চলের ক্ষয়িষ্ণু নৃগোষ্ঠী সর্বপ্রাণবাদী মান্দাইদের জীবন, সংস্কৃতি, বেদনা, সংগ্রাম আর সংখ্যাগরিষ্ঠের অহমিকায় চালানো বাঙালির নিপীড়নকে উপজীব্য করে রচিত হয় *বনপাংশুল*। ঢাকা থিয়েটার শুধু বাঙালির সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়ে নাট্যনির্মাণ করেনি। এ ভূখণ্ডের রোদে-জলে বেড়ে ওঠা আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীদের সংস্কৃতি ও তাদের বঞ্চনাকেও তুলে এনেছে মঞ্চের আলো আঁধারির মায়ায়। ১৯৯৪ সালে সেলিম আল দীনের রচনা ও নির্দেশনায় নির্মিত *একটি মারমা রূপকথা* তার অভিজ্ঞান। যার বিস্তার দেখি *বনপাংশুল* নাট্যে। পাঁচালির গড়ন নির্বাচনের নেপথ্যের ক্রিয়াশীলতা সেলিম আল দীনের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> বাঙলা উপাখ্যানের মডেলেই আধুনিকতা, সমকালীনতা, জীবন ও জগতের নানা স্তরের আন্তঃসম্পর্কের জটিল আবর্তসমূহের ধৃতি সম্ভব কিনা। উপরন্তু সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্য নির্মাণ কৌশলের অভিজ্ঞতায় পাঁচালির উপস্থাপনাকে একান্তরূপে কাব্য, উপন্যাস ও নাট্যের অনিবার্যস্থলে ন্যাস করা যায় কিনা তাও বুঝে নেয়া (আল দীন, ২০০১, কথামুখ)।

তিনি আরও বলেন–

> পাঁচালি বাঙালির সর্বব্যাপ্ত শিল্পরসাস্বাদনের আধার। একই সঙ্গে নৃত্য, গীত, রাগরাগিণী, আখ্যানগত উপাখ্যান, চরিত্রাভিনয়, বর্ণনার একটি শিল্পগত ও অন্যান্য নৈয়ায়িকতার অনিবার্য সংশ্লেষ পাঁচালি। অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজ্য-রাষ্ট্র ও নিসর্গিত স্বর্গ মর্ত জুড়ে দেবকল্প মানুষের এ এক বিস্তারিত উপস্থাপন। পাঁচালি উপাখ্যান ও বর্ণনাত্মক নাট্যের একাঙ্গী শিল্পরূপ, বাঙালির দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প রুচির মহাকাব্যিক গড়নের ধাঁচটাও পাঁচালিতে অন্বেষণ যোগ্য (আল দীন, ২০০১, কথামুখ)।

ইত্যবসরে *মৃত্যু সংবাদ* ও *হরগজ* নামক নাটক মঞ্চায়ন করে ঢাকা থিয়েটার। নব্যপাঁচালি আঙ্গিকের দ্বিতীয় নাটক *প্রাচ্য*। প্রকৃতি ও ক্ষমা কিংবা প্রচ্ছন্নরূপে শ্রেণীসংগ্রামের আবহ *প্রাচ্য*–এ দৃষ্ট। নব্যকালের পাঁচালি *প্রাচ্য* নাটকে দেখা যায়, শ্রমজীবী সয়ফর বাসররাতেই স্ত্রী নোলককে হারায় সাপের দংশনে এবং এক উল্টোপুরাণ আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। যেখানে লখিন্দর নয়, বেহুলাই মৃত হয় বিষে। সয়ফর স্ত্রীহত্যার প্রতিশোধ নিতে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। রাতভর ঘাতক সাপের খোঁজে খনন করে চলে

উঠোন থেকে ঘরের মাটি পর্যন্ত। ভোরে যখন সাপটিকে খুঁজে পায় উদ্যত ফণাতোলা, তখন হত্যা ভুলে যায় সয়ফর এবং সেই সাপ বিলীন হয় নোলকের কবরের ওপর দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে। নাটকটি নির্দেশনা দিতে গিয়ে নির্দেশক আমাদের ঐতিহ্যবাহী অভিনয়রীতির সঙ্গে কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কির অভিনয় পদ্ধতির সংযোগ ঘটানোর কথা বলেছেন।

> 'প্রাচ্যে'র মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে আমি আমার পূর্ববর্তী নাটকগুলোতে ব্যবহৃত বর্ণনাত্মক রীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করার চেষ্টা করেছি। আমি নিশ্চিত আমার নির্দেশনার ক্ষেত্রে এ একেবারেই অভিনব। আমার পূর্ববর্তী নাটকগুলোতে কথক বা গায়েন বা বর্ণনাকারী প্রায়শই কথা বলেছেন দর্শকদের সাথে। কিন্তু এ নাটকে তাঁরা কখনোই দর্শকদের সাথে কথা বলেন না। আমি তাঁদের এমনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি যেন প্রত্যেক বর্ণনাকারীই হয়ে উঠেন এক একটি চরিত্রের বুক থেকে বেরিয়ে আসা এক একটি অনুভূতি বা অনুভবের চিত্রকল্প। অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমি আমাদের চিরায়ত ও লোকজ অভিনয়রীতির সাথে স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়রীতির সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছি (ঢাকা থিয়েটার, প্রাচ্য, স্যুভেনির)।

কিন্তু এর মধ্যদিয়ে জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটি নির্মিত হয়ে যায়, যা ছিল ঢাকা থিয়েটার, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার এবং অতি অবশ্যই সেলিম আল দীনের আরাধ্য।

> 'চাকা'র পরবর্তী নাটক 'যৈবতী কন্যার মন' বাঙালির শিল্পদর্শন 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদে'র অস্থিসন্ধি-স্নায়ু-নদীর নানা বাঁক সমৃদ্ধ নাটক। ঔপনিবেশিক শিল্পশাস্ত্রের বৃত্তাবদ্ধতা থেকে বিমুক্ত জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করেছে এ-নাটক।'বাঙলা পরিবেশনা মূলক গেয়' কাব্যের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে বাঙলা নাট্যের নিজস্ব আঙ্গিকের বিকাশ পর্বের একটা বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাসও এ-নাটকের অন্যতম বিষয় রূপে পরিগণিত। উল্লিখিত ধারার পর সেলিম আল দীন মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের চর্চিত অত্যন্ত শ্লাঘ্য শিল্প আঙ্গিক পাঁচালি রীতিতে রচনা করেন 'বনপাংশুল, 'প্রাচ্য'। ১৫-শতক থেকে ১৮-শতক পর্যন্ত কালসীমায় বাঙালির বাণীশিল্প নান্দনিক মুক্তি লাভ করেছে পাঁচালির আধারে। বলতে দ্বিধা নেই প্রাচ্যের মধ্যদিয়ে সেলিম আল দীন তাঁর জাতীয় নাট্য-আঙ্গিক রচনার অঙ্গীকার ষোলআনা পূর্ণ করেন (রহমান, ২০০৯, পৃ. ২১৯)।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ সময়ে তবে বাংলা নাটককে তবে শনাক্ত করা সম্ভব কীরূপে? পাশ্চাত্যরীতি বহাল রেখে আজও রচিত হচ্ছে নাটক, বাংলা ভাষায়। সমালোচকের ভাষায় –

> বাংলা ভাষায় রচিত হলেই সে নাটক বাংলা নাটক নয়; একই সঙ্গে বাংলা নাট্যরীতিতে রচিত নাটকও তাকে বলা যাবে না। অর্থাৎ বাংলা ভাষার রচিত নাটক এবং বাংলা নাটকের ব্যবধি বিস্তর।বাংলা নাটক প্রথমত বাংলা ভাষায়রচিত নাটক। দ্বিতীয়ত তার অঙ্গ-সংস্থানে বাংলা সংস্কৃতির বিবিধ বিচিত্র উপাদান সংস্থিত–বাঙালির রুচি, রসাভিব্যক্তি, মানসরূপ, সমাজপদ্ধতির ধরন, নৃত্য-সঙ্গীত-ধর্মসাধনা, সৌন্দর্যবোধ বাংলা নাটকের আত্মা-ধমনী-শিরার রক্তপ্রবাহে বিদ্যমান (রহমান, অপ্রকাশিত, 'বাংলা নাট্যরীতিঃ সম্ভাবনা দিগন্তে')।

অর্থাৎ এই স্থির প্রত্যয়ে স্থিত হওয়া সম্ভব যে–

> বাঙালির আচার-আচরণ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার ঐতিহাসিক সংগ্রাম-সিদ্ধি, আর্থনীতিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা, পুরাণ-রূপকথা, সংস্কার-বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৃত্যাদি, প্রথা-উৎসব, খাদ্য-অভ্যাস, সামাজিক নীতিনৈতিকতা, আচার ক্রিয়াদি ইত্যাদি বিষয় কেন্দ্রিক পরিবেশন যোগ্য রচনা বাংলা নাটক এবং একই সঙ্গে তা বাঙালিরও নাটক (রহমান, ২০১২, পৃ. ২৮)।

এ প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট ভাষায় বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়–

> বাঙালির হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাসের ধারায় বাহিত সংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয়-বিষয়ী সংবলিত আখ্যান, ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যরীতির আধারে কিংবা তার নবীকৃত আধারে সন্নিবেশিত হলে তাকেই কেবল বাংলা নাটক বলা যাবে। সে আঙ্গিকের মৌল অঙ্গ: ক. আখ্যান; খ. চরিত্র; গ. সংলাপ; ঘ. সংগীত; ঙ. নৃত্য; চ. বর্ণনা (রহমান, অপ্রকাশিত, 'বাংলা নাট্যরীতি: সম্ভাবনা দিগন্তে')।

কিন্তু কেন বাংলা নাটককে এই কাঠামোয় ফেলে বিচার করতে হবে? এর উত্তর সেলিম আল দীনের কথায় খোঁজা যেতে পারে–

> বাঙলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক সহস্র বছরের ধারায় বাহিত হয়েছে কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহমনে অদ্বৈতের ঝঙ্কার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি– নৃত্যকে করেছে তার ধমনী– কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ– তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেও বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে। আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব-ধর্ম-চণ্ডী-মনসা-গাজী-মানিকপীরের কৃত্যের অবলম্বন যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা– আসর ও দর্শক অবলম্বন করেই বিস্তারিত হয় (আল দীন, ২০০৯, পৃ. ৩২৬)।

ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়েছে, জাতীয় নাট্য আঙ্গিক বলতে ঢাকা থিয়েটার যে রীতি-পদ্ধতি নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিল, তা সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত হয়েছে নাটকের রচনাশৈলী-অভিনয় ও পরিবেশনার রূপটি। অর্থাৎ বিষয়টি খোলাসা করে বললে দাঁড়ায়–

> বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি পাশ্চাত্যের স্বীকৃত রীতি, পদ্ধতি ও কৌশল থেকে ভিন্ন। পাশ্চাত্যের অভিনয় প্রাচীনকাল থেকে অনুকরণতত্ত্বের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। অনুকরণাত্মক অভিনয় হচ্ছে ঘটনা, কাহিনীও চরিত্রে বস্তুজগতের ক্রিয়া ও দৃশ্যমূল্যের এমনতর আরোপ যা দর্শকের সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম। এ জন্য এ রীতিতে আহার্য বচন চরিত্র সর্বত্র বাস্তব জগতের প্রতিভঙ্গীকরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরেবর্ণনাত্মক অভিনয় হচ্ছে বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্র ঘটনা ও কাহিনীর উপস্থাপনা। এর দার্শনিক অভিপ্রায় হচ্ছে ব্যাখ্যা– প্রতিভঙ্গী সৃষ্টি করা নয়। এর বাহ্যিক অবলম্বন তাই অভিনয় নয়,– বর্ণনা।
>
> বর্ণনার অর্থ বিবরণ। বিবরণ অভিনয়ের অঙ্গে মক্ষিত ও লিপ্ত থাকে বলেই একে বলা যায় বর্ণনাত্মক অভিনয়। আধুনিক অর্থে বাস্তবতা এ রীতির লক্ষ্য নয় বরং বর্ণনাকে শিল্পিত করার প্রয়াসই বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রধান লক্ষ্য। শিল্পিত করার নিমিত্ত তাই গায়েন এ রীতিতে আশ্রয় নেয় নৃত্য সুর তাল ছন্দের। [...]
>
> ভাষারীতিতে বলার নানান ধরন আছে। বিবরণের সুরে চরিত্রের সংলাপে উপনীত হতে বর্ণনাত্মক রীতিতে বিবরণের প্রবাহ থেকে কথক বিচ্ছিন্ন হন না। এমনকি প্রত্যক্ষ সংলাপকেও গায়েন নিষ্ক্রিয় সংলাপে রূপান্তরিত করতে পারেন। ফলে তাঁর বর্ণনায় তিন ধরনের কৌশল থাকে– বিশুদ্ধ বর্ণনা-সংলাপকে নিষ্ক্রিয় করে বলা এবং সরাসরি বিদিতপন্থায় সংলাপের প্রয়োগ। কিন্তু যদি গায়েনের মুখে পুরা কাহিনীটাকেই একটা সংলাপ হিসাবে বিবেচনা করি––তাতে বর্ণনা––সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সংলাপের ব্যবহার––সংগীত প্রভৃতি নানান স্তর মিশ্র ও অবিমিশ্র রূপে দেখতে পাই।
>
> বর্ণনাত্মক অভিনয়ের নানান ভেদ আছে। কতক অভিনয়ে (১) গায়েন বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয় নেন (২) কতক অভিনয়ে গায়েন কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলাকে

> নানা ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। আবার (৩) দোহার সহযোগে সরাসরি চরিত্রাভিনয়ের রীতিও রয়েছে লীলাযাত্রা জারী প্রভৃতি শ্রেণির নাটকে। এছাড়া আছে আধুনিককালে যাত্রার শুদ্ধ চরিত্রাভিনয়রীতি (আল দীন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩১২-৩১৩)।

নাট্য রচনা, অভিনয় ও নির্দেশনার তাত্ত্বিক পাটাতনে দাঁড়িয়ে ঢাকা থিয়েটার একে একে মঞ্চে উপস্থাপন করে *ন নৈরামণি*, শিমূল ইউসুফ অভিনীত একক অভিনয়নির্ভর নাট্য *বিনোদিনী* এবং পৃথিবীর বিভিন্ন গণহত্যাকে উপজীব্য করে রচিত *নিমজ্জন*।

বর্ণনাত্মক ধারায় রচিত ও মঞ্চে উপস্থাপিত হয় *ন নৈরামণি* নাটক। বাংলা নাট্যের ইতিহাস হাজার বছরের বলে গবেষণায় দাবি করা হয়, তার প্রধান নিদর্শন *চর্যাপদ*। সেই চর্যাপদের ভেতর লুপ্ত হয়ে থাকা কাহিনিই উঠে এসেছে এই নাটকে। কিন্তু *চর্যাপদ* পরিবেশনার প্রত্যক্ষ কোনো নিদর্শন না থাকায় কিছু পদের মধ্যে থাকা ঈঙ্গিতই সম্বল। এ প্রসঙ্গে নাটকটির নির্দেশক বলেন–

> চর্যার কিছু পদ বিশ্লেষণে প্রযোজনারীতি সম্পর্কে জানা যায় যে, চর্যার পরিবেশনারীতিতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত অংশ গ্রহণে নৃত্য ও গীত অভিনয় উপাদান প্রয়োগে পরিবেশিত হতো এবং গীত যা সুস্পষ্ট ভাবেই বর্ণনাত্মক (ঢাকা থিয়েটার, ন-নৈরামণি, স্যুভেনির)।

আবার পরবর্তী প্রযোজনা *বিনোদিনী* নির্দেশনা প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন–

> বর্ণনা, সংলাপ, নৃত্য, সঙ্গীত ও শরীরের ভাষা দিয়ে আমি নাট্য-ছন্দ তৈরি করি যা আমার বিবেচনায় মঞ্চকবিতা। যাহোক একক অভিনয়ের সিদ্ধান্তের কারণে আমি আমার বর্ণনাত্মকরীতির পথই বেছে নিলাম (ঢাকা থিয়েটার, বিনোদিনী, স্যুভেনির)।

আধুনিক বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির প্রয়োগিক ক্ষেত্রে দলটির অন্যতম অভিনয়শিল্পী শিমূল ইউসুফ যেন বা ক্রমে উদাহরণ হয়ে ওঠেন। যে কারণে শিমূল ইউসুফের পঞ্চাশতম জন্মদিবস উপলক্ষে লিখিত 'নিবেদন ভাষ'-এ সেলিম আল দীন বলতে পারেন–

> বাঙালির সহস্র বৎসরের সাধনা তোমাতেই পূর্ণ হোক। মঞ্চে বাঙালির ধ্রুপদি অহঙ্কারকে তুমি পুনর্বার সৃজন করেছো আপন ক্ষমতায়। উপনিবেশীয় শিল্পরীতির বিরুদ্ধে তুমি এক দিব্যাস্ত্র। আত্মবিস্মৃত উচ্ছিন্নমূল জাতির সামনে তুমি এনেছো জাতিগত অভিজ্ঞানপূর্ণ অভিনয়রীতি (চৌধুরী-সম্পা., মঞ্চকুসুম শিমূল ইউসুফ, ২০১২, পৃ.৫)।

সেই বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির প্রয়োগ কেমন তরো, তার একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে নাটকটির নির্দেশকের ভাষ্যে–

> শিমূলের চরিত্রাভিনয় কৌশলের মূল আকর হচ্ছে সঙ্গীতের গঠন ও চলন। নাটকের চরিত্রের সকল সেট, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মন-প্রাণ ভেঙ্গেচুড়ে উন্মোচিত করে, সঙ্গীতের আলাপ, বিস্তার, আরোহন, অবরোহণ, তাল, লয়, ছন্দের মাঝে তা পুনর্নির্মাণ করে, নাট্যের বিস্তারে প্রতিস্থাপন করে, চরিত্র বিনির্মাণের এক জটিল অথচ সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় তার নিষ্পত্তি (চৌধুরী, ২০১২, পৃ. ৮২)।

এরপর ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে নিয়ে আসে *নিমজ্জন*। নব্যপাঁচালি আর কথানাট্যের মিশেলে সেলিম আল দীন সৃজন করেন এই নাটক এবং এর মধ্যদিয়ে একটি নতুন শিল্পপরিভাষাও আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়, ফোররিয়ালিজম বা সম্মুখবাস্তববাদ। এই নাটকের নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইন্সটেলেশন শিল্পমাধ্যমকেও আত্মীকরণ করা হয়েছে। এ নাট্যের নির্দেশক বলেন–

> নাটকের নির্দেশনায় আমি ঢাকা থিয়েটার উদ্ভাবিত ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যরীতির সমকালীন ও সম্ভাব্য রূপটিকে মূর্ত করার চেষ্টা করেছি। নাট্যের প্রাচ্য রীতির আদর্শটা আমার নাট্য ভাবনার প্রধান অবলম্বন। এবং শিল্প ভাবনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের যে আত্মিক সম্পদ সহস্র বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে আমি নিজেকে তার উত্তরাধিকারী বলে মনে করি (ঢাকা থিয়েটার, নিমজ্জন, স্যুভেনির)।

নিমজ্জন মঞ্চায়নের অনতিকাল পর সেলিম আল দীনের অন্তর্ধানে যে প্রশ্নটি সামনে চলে আসে সেটি হচ্ছে– এখন ঢাকা থিয়েটার জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের চর্চা করবে কীভাবে? তারই উত্তর খোঁজা যেতে পারে ঢাকা থিয়েটারের পরবর্তী প্রযোজনাগুলোর নাটক নির্বাচন ও প্রয়োগ কৌশলের নিরিখে। প্রশ্নটির সুরাহা হিসেবেই যেন বা কিছু সময়ের ব্যবধানে ঢাকা থিয়েটার মঞ্চে আনে *ধাবমান*। বর্ণনাত্মক বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রকাশ এই নাট্য এবং তা রচনা থেকে শুরু করে নির্দেশনা, মঞ্চ, অভিনয় সবকিছুকেই একাঙ্গে প্রকাশ করছে। একটি বলদর্পী ষণ্ডমোষ সোহরাবকে ঘিরে নির্মিত হয়েছে এই রচনার বৃত্ত। আমরা দেখি, এক শ্রমজীবী মানুষ নহবতের কাছে সোহরাব সন্তানের মতোই লালিত-পালিত হয়। যৌবনে সোহরাব নহবতের স্বপ্নপূরণ করে মোষের নাড়াই–এ সোনার মেডেল জয়ের মাধ্যমে। কিন্তু একসময় তাকে প্রাণ দিতে হয় কসাইয়ের ছুরির তলে। গৃহপালিত প্রাণীদের এই যেন ভবিষ্যৎ পরিণতি। কিন্তু এই উপরিকাঠামোর অতলে রয়েছে, ক্ষয়িষ্ণু নৃগোষ্ঠী মান্দি, আমরা যাদের বলি গারো, তাদের স্বপ্নভঙ্গ, পরাজয়, কৃত্য আর আত্মযন্ত্রণার মর্মস্পর্শী চিত্র। যে বাঙালি কিছুকাল পূর্বে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তারাই এইসব সর্বপ্রাণবাদী নৃগোষ্ঠীগুলোকে লুপ্তপ্রায় করে দেয়ার কর্মকাণ্ডে নেমেছে। নাটকটির নির্দেশক শিমূল ইউসুফ বলেন–

> তোমাদের সাথে ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যরীতির চারণভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে এইটুকু তো বুঝতে শিখেছি যে আমাদের অহংকার করবার মতো আছে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ঔপনিবেশিকতা থেকে কীভাবে নিজেদের বিযুক্ত করতে হবে সেই নির্দেশগুলোও কানে বেজেছে বার বার। তাই এই বিস্তারিত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির চারণভূমি থেকে তুলে নিলাম মাদারপীরের গীত, পদ্মার নাচন, মহররমের জারী, নটপালা, লাঠি খেলা, কাছ নৃত্য (ঢাকা থিয়েটার, ধাবমান, স্যুভেনির)।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা থিয়েটারের প্রধান নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন–

> এ জনপদের সকল মানুষের নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী যে নাট্যরীতি ও আঙ্গিক সেলিম সেগুলোকে নির্দিষ্ট করেছিলেন জাতীয় নাট্য আঙ্গিক হিসেবে। এ আঙ্গিকগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে সেলিম রচনা করলেন আধুনিক বাংলা নাটক, যা সর্বাংশে ঔপনিবেশিক অবলেশমুক্ত বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতি। শুধু সংলাপ নির্ভরতা নয়, সংগীত-নৃত্য-বর্ণনা-সংলাপ মানবকুলের সকল শিল্প অভিব্যক্তির সংশ্লেষে বর্ণনাত্মক যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বেও জন্ম দিলেন সেলিম তা আমাদেও বিশ্ব শিল্পধারায় নিশ্চিত একটি নতুন সংযোজন (ঢাকা থিয়েটার, নিমজ্জন, স্যুভেনির)।

তারপর ঢাকা থিয়েটার একে একে মঞ্চায়ন করে *নষ্টনীড়*। প্রথমবারের মতো ঢাকা থিয়েটার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো রচনা মঞ্চায়নে তৎপর। *নষ্টনীড়* গল্পটিকে নাটকে রূপ দেয়ার প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের প্রতি দলটির আস্থাই যেন প্রতিফলিত হয়।

> গল্প পাঠের আর নাট্য হচ্ছে শ্রব্য ও দৃশ্যের দ্বৈত উদযাপন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালার বৈশিষ্ট্য এবং নিরাভরণতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত ছিল। আড়ম্বরপূর্ণ অথবা স্বাভাবিকতার অভিজ্ঞতাবাহী মঞ্চ স্থাপত্যকে খারিজ করেছেন তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমবেত দর্শকের মন আর কল্পনার ক্যানভাস যেখানে যে কেউ আপন শিল্পিত বোধের

> রঙে এঁকে নেবেন ঘটনার চিত্ররূপ। চিত্রপট নয় চিত্তপটই ছিল রবীন্দ্রনাথের গন্তব্য। ফলে আখ্যানরূপ দেয়ার ক্ষণটিতে তাঁর এই বিবেচনা আমাকে প্রহরা দিয়েছে। আমি চেয়েছি আমাদের ঐতিহ্যসংলগ্ন রীতিতেই গড়ে উঠুক এ দৃশ্যকাব্যের রূপ। এ কারণেই 'নষ্টনীড়' গল্পের সংলাপাত্মক অংশটুকু প্রায় অক্ষুণ্ন রেখে চরিত্র ও ঘটনার বিকাশে নিয়েছি বর্ণনার আশ্রয়। তাতে রবীন্দ্রনাথের শব্দ ও ভাষার মাধুর্য যেন এ কালের ছাঁচে পড়ে বিবর্ণ হয়ে না পড়ে সেখানেও নিতে হয়েছে বাড়তি সতর্কতা। আর এই রূপবিভ্রমকাণ্ডে, রূপান্তরেরকালে গিয়ে দাঁড়িয়েছি রুক্মবর্ণ শিল্পী সেলিম আল দীনের দরজায়। তাঁর প্রবর্তিত কথানাট্য আঙ্গিকের আশ্রয়েই গড়েছি রবীন্দ্ররচনার নাট্যরূপ। আর তা এই বিবেচনাতেই যে, বাংলানাট্যের আঙ্গিকবাদিতার ক্ষেত্রে দুজনই প্রায় অভেদ দর্শনে আস্থাশীল, ফলে উভয়ের সৃষ্টিশীলতার সংমিশ্রণ আমাদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার প্রান্তরে হয়তো বা ছড়াতে পারে নতুন কনক আভা। 'নষ্টনীড়' আখ্যানের অভিপ্রায়ও তাই (ঢাকা থিয়েটার, নষ্টনীড়, স্যুভেনির)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার স্মারক হিসেবে প্রযোজিত *নষ্টনীড়* নাটকের নির্দেশকের বক্তব্য থেকেও জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের প্রতি অঙ্গীকারের খোঁজ পাওয়া যায়।

> বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য রীতিতে রবীন্দ্রনাথের আস্থা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে শিখেছিলেন নাট্য প্রযোজনায় 'দ্রব্যরাশি' ও 'আড়ম্বর' বর্জন করবার দীক্ষা এবং রিক্ত আয়োজনেও তিনি নাট্যাভিনয়কে ফলবান করতে পারতেন (ঢাকা থিয়েটার, নষ্টনীড়, স্যুভেনির)।

পরবর্তী প্রযোজনা *জিয়ন্তকাল* নাটকটি নব্যপাঁচালি আঙ্গিকে রচিত। পথনাটক হিসেবে এটি বর্ণনাত্মক রীতির অনুসরণে নির্মিত হয়েছে, যা আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনায় সহজেই উৎড়ে যায়।

এরই মধ্যে ২০১২ সালে লন্ডনে অলিম্পিকের অংশ হিসেবে বিশ্বখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র রচিত ৩৭টি নাটক ৩৭টি ভাষায় শেক্সপিয়র প্রতিষ্ঠিত গ্লোব থিয়েটারে মঞ্চায়িত হয়েছে। বাংলা ভাষায় একমাত্র নাটকটি মঞ্চায়ন করেছে ঢাকা থিয়েটার। শেক্সপিয়র রচিত *দ্য টেম্পেস্ট* নাটকটি বাংলার সার্বভৌম নব্যপাঁচালি ও কথানাট্য আঙ্গিকে রূপান্তর করা হয়। সেই রূপান্তর মঞ্চে পরিবেশনাতেও আশ্রয় করা হয় ঐতিহ্যবাহী রীতির এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয় মণিপুরী নটপালার আঙ্গিক। নাটকটি বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করে। ঢাকা থিয়েটারের যে স্বপ্ন ছিল 'বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে ঝংকৃত হোক বাঙলা নাটকের শাশ্বত রূপ' তাই যেন বা বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। এ প্রসঙ্গে নাটকটির অনুবাদক ও রূপান্তরকারীর বক্তব্য হচ্ছে–

> হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডের কবিগণ তাঁদের নাট্যমূলক ক্রিয়া পরিবেশন করে আসছেন পাঁচালি নামক এক বিশেষ শিল্পাঙ্গিকের মাধ্যমে। আধুনিক সময়ে নাট্যচার্য সেলিম আল দীন সেই ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিককে পুনর্নির্মাণ করেন। আমিও অগ্রসর হয়েছি সেই পথেই। *দ্য টেম্পেস্ট* নাটকটিকে বিন্যস্ত করেছি পাঁচালির সার্বভৌম আঙ্গিকে, যাকে আমরা চিহ্নিত করি নব্যপাঁচালি অভিধায়। এ ক্ষেত্রে আমার বিবেচনা এই যে, বাঙলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকের সেই শক্তি রয়েছে, যেকোনো শিল্পকে যা আত্মস্থ করতে সক্ষম। *দ্য টেম্পেস্ট*'র অনুবাদ ও রূপান্তরে সেই বিশ্বাসলব্ধ নীরিক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছে। পাশাপাশি নাটকটির বাঙলায়ন চলাকালীন দেশ, কাল ও সংস্কৃতির ইশারা নিয়ত ঘূর্ণায়মান ছিল আমার প্রতিবেশে। দেশের ক্ষমতা কাঠামোয় অংশীদারিত্বের জন্য চর্চিত অপরিমেয় কূটচাল, আমাদের মননে প্রবিষ্ট করে দেওয়া ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আধিপত্য ইত্যকার বিষয়গুলো গ্রন্থিত করেছি সচেতন পারম্পর্যে। পরিহার করেছি পাশ্চাত্যের অঙ্ক-দৃশ্য বিভাজনের ধারা। এমন অনেক অনুষঙ্গই এতে অঙ্গীকৃত হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ উন্মোচন

> শেক্সপিয়রে নাই, কিন্তু দূরবর্তী আভাসই এই নাট্যে আভাময় হয়েছে শিল্পের নান্দনিক কৌশলে। ভিন্ন সময়ের, ভিন্ন ভূগোলের স্বাধীন শিল্পী হিসেবে সেই অধিকার তো আমি গ্রহণ করতেই পারি। আশা রাখি, কোথাও তা পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে তুলবে না বেসুরো আওয়াজ। বাংলাভাষায় এ জাতীয় প্রচেষ্টার দ্বিতীয় উদাহরণ জানা নাই। গীত, সঙ্গীত, কাব্য, সংলাপ, বর্ণনা ও নৃত্যকে একাঙ্গে ধারণ করে পাঁচালির যে অদ্বৈতরূপ, ঢাকা থিয়েটারের *দ্য টেম্পেস্ট* সেই পরম্পরানিষ্ঠ মঞ্চরূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের মঞ্চায়নে যে নিরাভরণতার আশ্রয়ী, দৃশ্যনির্মাণে দর্শকের কল্পনাশক্তিতে তাঁর যে আস্থা, সেলিম আল দীন আত্মসৃষ্টিতে যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদে স্থিত, আমার অনুবাদ-রূপান্তর ও ঢাকা থিয়েটারের পরিবেশনাতেও সেই অমর্ত্যমানবদ্বয়ের প্রেরণাই ক্রিয়াশীল। এই নাট্য তাই রবীন্দ্র-সেলিমের বেশে যাবে শেক্সপিয়রের দেশে (ঢাকা থিয়েটার, দ্য টেম্পেস্ট, স্যুভেনির)।

নাটকটির পরিকল্পক ও নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ এই নাট্য নির্দেশনার সময় আমাদের নাট্যরীতির শক্তি পুনরায় উপলব্ধি করে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত। তিনি বলেন–

> যখন বিশ্ব নাট্যোৎসবে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের ঢাকা থিয়েটার *দ্য টেম্পেস্ট* মঞ্চায়ন করবে, তাই সকল বাধা অতিক্রম করে আমাদের মহড়াকক্ষে প্রায় প্রতিমুহূর্তে নতুন নাট্যভাষা আবিষ্কার এবং প্রয়োগ এই প্রক্রিয়া চললো দিনের পর দিন। ধীরে ধীরে আমরা লক্ষ করলাম, শেক্সপিয়রের *দ্য টেম্পেস্ট* বাংলা নাট্যরীতি এবং প্রয়োগে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে দৃশ্যমান হতে থাকলো। [...] আমার নির্দেশনার মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিকতার শিকার মানুষের ক্ষোভ-সংগ্রামকে সম্যক উদ্ভাসন করা। সেলিম আল দীনের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' তত্ত্বের আলোকে তা করার প্রয়াস নিয়েছি। নৃত্য, গীত, সংলাপ, অভিনয় সবকিছুর আলাদা অস্তিত্ব মান্য করে অভিন্ন এক শিল্পরূপ খোঁজার চেষ্টা রয়েছে আমার এ নির্দেশনায়। এ প্রযোজনায় আমি যুগপৎ বিস্ময় এবং আনন্দের সাথে প্রত্যক্ষ করেছি, ঐতিহ্যবাসী বাংলা নাট্যরীতির গ্রহণক্ষমতা দেখে। শেক্সপিয়রের মত মহৎ কবি এবং নাট্যকারের শক্ত গাঁথুনির পঞ্চাঙ্কের নাটককে অনায়াসে আমাদের নাট্যরীতি ও ভাষায় মঞ্চায়ন সম্ভব (ঢাকা থিয়েটার, দ্য টেম্পেস্ট, স্যুভেনির)।

দ্য টেম্পেস্ট মঞ্চায়ন উপভোগ করে জনৈক সমালোচক বলেন–

> দেখা খুব জরুরি যে এই রচনা যখন পাঠ করি তখন শেক্সপিয়র উপস্থিত থাকেন কিনা এবং যখন অভিনীত হয় তখনও তাকে অনুভব করা যায় কিনা? এ কারণে বারবার ঢাকা থিয়েটারের 'দ্য টেম্পেস্ট' দেখেছি এবং পাশাপাশি গ্লোবে শেক্সপিয়রের মূল রচনার পরিবেশনা, 'টেম্পেস্ট' নিয়ে সিনেমা এবং 'টেম্পেস্ট'র নানা নিরীক্ষা দেখেছি। সকল কিছু বিচারে আমার কাছে ঢাকা থিয়েটারের কথানাট্য 'দ্য টেম্পেস্ট' পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে মূর্ত হয়েছে (মান্নু, ২০১৭, পৃ. ২০৫)।

তিনি আরও বলেন–

> দ্য টেম্পেস্টের নির্দেশক নাটকটির পরিকল্পনায় একই তাল-লয় সকল স্তরে কবিতার মত করে সম্পন্ন করেছেন। দ্য টেম্পেস্টের পরিবেশনায় বাংলাদেশ একটি পেইন্টিং হিসেবে ঢাকা থিয়েটারের টেম্পেস্টে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্য টেম্পেস্ট নাটকটিকে আমি বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনা হিসেবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী (মান্নু, ২০১৭, পৃ. ২১০)।

বোঝা যাচ্ছে, পাঁচালি বা কথানাট্যের গ্রহণক্ষমতা অপরিসীম। সেই ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে আমরা ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পশ্চিমা নাট্যরীতির দ্বারস্থ হয়েছি দীর্ঘকাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে বলেছেন–

> বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে (ঠাকুর, ২০১১, পৃ. ৬৮১)।

কিন্তু দীর্ঘকাল আমরা সে পথে হাঁটিনি। ফলে এ কথা তো বলাই যায়–

> পাঁচালির আখ্যান অংশে যে নাটকীয়তা বিদ্যমান এবং আসরে পরিবেশনের যে উপযোগিতা এর অঙ্গ সংস্থানে পরিদৃষ্ট হয় তা অনিবার্যভাবেই প্রমাণ করে যে ঔপনিবেশিক শিল্পতত্ত্ব উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া না হলে নৃত্য-গীত-কথা-সংলাপ ও সরস বর্ণনার আশ্রয়ে পাঁচালির অভ্যন্তরেই আধুনিক বাঙলা নাটকের জন্ম হতো। এবং তা ছিলো অনিবার্য ও ইতিহাস সম্মত (রহমান, ২০০৯, পৃ. ৯৪)।

এরপর ঢাকা থিয়েটার একে একে মঞ্চায়ন করে *পঞ্চনারী আখ্যান*, *স্পার্টাকাস*, *আউটসাইডার*। পুরোপুরি না হলেও এই প্রতিটি প্রযোজনাই অনেকাংশে বর্ণনাত্মক নাট্যের শক্তির আধারে নির্মিত।

'নতুন প্রজন্ম নতুন থিয়েটার' স্লোগানে ঢাকা থিয়েটার আয়োজন করে সেলিম আল দীন উৎসব। তাতে সেলিম আল দীন রচিত চারটি নাটক মঞ্চায়িত হয়। নাটকগুলো হচ্ছে– *গল্প নিয়ে গল্প*, *অমৃত উপাখ্যান*, *ইতি পত্রমিতা*, *ঊষা উৎসব*।

ঢাকা থিয়েটারের *গল্প নিয়ে গল্প* মূলত একটি গল্পই। এটি মঞ্চায়নে নাটকে ইশারা ভাষার ব্যবহার করা হয় যা আমাদের নাগরিক মঞ্চে নতুনত্বের দাবি রাখে। পরবর্তীতে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের নিয়ে কয়েকটি নাটক নির্মাণ করে ঢাকা থিয়েটার।

অমৃত উপাখ্যান সেলিম আল দীন রচিত একমাত্র উপন্যাস। নাট্যরূপ ব্যতিরেকে এই উপন্যাস মঞ্চায়নে নির্দেশকের কথায় বলা হয়–

> নাটকটির নির্দেশনায় ঢাকা থিয়েটার সৃজিত বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি ও আমাদের ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যরীতির প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়েছে (ঢাকা থিয়েটার, 'সেলিম আল দীন উৎসব ২০১৪', প্রচার পুস্তিকা)।

ইতি পত্রমিতা মূলত টেলিভিশন নাটক। সেটি বর্ণনাত্মক ধারায় নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চায়ন করা হয়। নাটকটির নির্দেশনা প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন–

> উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমি বাংলার ঐতিহ্যবাহী সঙপালা ও ইউরোপীয় কমেডিয়া দেল আর্তের মিশ্রণ ঘটিয়েছি (ঢাকা থিয়েটার, 'সেলিম আল দীন উৎসব ২০১৪', প্রচার পুস্তিকা)।

ঊষা উৎসব প্রসঙ্গে নির্দেশক বলেন–

> নাট্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় আঙ্গিক বর্ণনাত্মকরীতি ব্যবহার করেছি। এখানে নৃত্যকে অবলম্বন করে নাট্যকে প্রধান করেছি (ঢাকা থিয়েটার, 'সেলিম আল দীন উৎসব ২০১৪', প্রচার পুস্তিকা)।

এরপরই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে লন্ডনের গ্রে আই থিয়েটারের সঙ্গে যৌথভাবে নির্মিত হয় *ডিফারেন্ট রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট*। নাটকটির অনুবাদক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়।

তারপর মঞ্চে আসে *আওয়ার কান্ট্রিজ গুড* ও *রাই কথকতা*। প্রথমোক্ত নাটকটি পাশ্চাত্যের আঙ্গিক-ঘরানায় নির্মিত হয় এবং এর নির্দেশক হুমায়ুন কবীর হিমু। কিন্তু পরবর্তী নাটকটি আমাদের বর্ণনাত্মকরীতিকে মান্য করে নির্মিত। এটি নির্দেশনা দিয়েছেন শেখ এহসানুর রহমান।

দ্বিতীয় বারের মতো নির্দেশনায় এলেন শিমূল ইউসুফ। সেলিম আল দীন রচিত *পুত্র* মঞ্চায়ন করে ঢাকা থিয়েটার। নাটকটির নির্মাণ প্রসঙ্গে নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন–

> বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির যে শিল্পদাবী, শিমূল অভিনব দ্বৈত চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাকে অধিকতর বর্ণনাত্মক করে তুলেছেন। শিমূলের পুত্রে আমরা সাক্ষাৎ পাবো সিরাজ ও আবছার ছায়া চরিত্র। এক সিরাজ অন্য এক সিরাজে অথবা এক আবছা অন্য এক আবছায় মূর্ত হয় আবার লীন হয়। এক জটিল নাটকের জটিল এক নির্দেশনায় পুত্র নাটক ক্রমশ লতিয়ে উঠে মঞ্চে (ঢাকা থিয়েটার, পুত্র, স্যুভেনির)।

এরপর ঢাকা থিয়েটার আবারও মঞ্চে উপস্থাপন করে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে নাটক *ফিয়ারলেস*। এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত সর্বশেষ মঞ্চে উপস্থাপন করে বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত নাটক *একটি লৌকিক অথবা অলৌকিক স্টিমার*।

প্রতিষ্ঠাকালে ঢাকা থিয়েটার অঙ্গীকার করেছিল–

> আমাদের লক্ষ্য জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণ। শহরের মঞ্চে ঢাকা থিয়েটার বাংলাদেশের মৌলিক নাটকের অপ্রতিরোধ্য বৃত্তটি রচনা করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে ক্রমে তা প্রসারিত করেছে। গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলেছে গ্রাম থিয়েটার। এদেশের মানুষের জীবন ও তার শিল্পিত রূপটি সমাজ রূপের মধ্যদিয়ে একদিন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে একালের শিল্পসাধনা আগামীকালের মধ্যে পাবে পূর্ণতার আনন্দ (ঢাকা থিয়েটার, হাত হদাই, প্রচার পুস্তিকা)।

হাজার বছর ধরে যে রীতি এই বৃহৎ অঞ্চলের শ্রমজীবী-প্রান্তিক মানুষের জীবনে প্রবাহিত ছিল, সেখান থেকে নমুনা-প্রেরণা নিয়ে ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছে 'জাতীয় নাট্য আঙ্গিক'। বলা যায়–

> বাঙালির সহস্র বছরের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট নাট্য-আঙ্গিকটি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতির গীতিপ্রবণ মানসিকতা বিধৃত আঙ্গিকটি কাব্য-নৃত্য-গীত-চিত্রময় বর্ণনা-কথা বা সংলাপ-বাদ্য এই পঞ্চশিল্পের সুসমন্বয়ে সৃষ্ট। (রহমান, ২০০৯, পৃ. ২১৯)।

আজ 'আধুনিক বর্ণনাত্মকরীতি' বলতে সেই রীতিকেই বোঝা যায়, দীর্ঘকাল ধরে ঢাকা থিয়েটার যে রীতি প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে এসেছে। দলগত চর্চার পাশাপাশি দেশব্যাপী তা ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টাও সমানতালে অব্যাহত ছিল। ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় যে, শত শত নাট্যদল ও তাদের সদস্যগণ চেতন-অবচেতন স্তরে এই আধুনিক বর্ণনাত্মকরীতির আশ্রয়ে– রচনার ধরন, অভিনয়শৈলী ও নির্দেশনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যখন জাতীয় পর্যায়ে রীতিটির চর্চা হচ্ছে বৃহৎ পরিসরে তখন বলার অপেক্ষা রাখে না, রীতিটি তবে সিদ্ধ হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

গ্রন্থ

আল দীন, সেলিম (১৯৮৬), *তিনটি মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (১৯৯১), *চাকা*, গ্রন্থিক, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (১৯৯৭), *হাত হদাই*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০০১), *বনপাংশুল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (২০০৯), *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আল দীন, সেলিম (ফেব্রুয়ারি ২০০৯), *রচনাসমগ্র ৪*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমদ, আফসার (১৯৯২), *মঞ্চের ট্রিলোজি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, গ্রন্থিক, ঢাকা।

চৌধুরী, বেলাল (২০১২), *মঞ্চকুসুম শিমূল ইউসুফ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ফানো, ফাঞ্জ (২০০৬), *জগতের লাঞ্ছিত*, (অনুবাদ- আমিনুল ইসলাম ভুইয়া), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রহমান, লুৎফর (২০০৯), *কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

রহমান, লুৎফর (২০১২), *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, নান্দনিক, ঢাকা।

প্রবন্ধ

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১), 'রঙ্গমঞ্চ', *রবীন্দ্রসমগ্র ৩*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

মান্নু, মাসউদ ইমরান (২০১৭), 'বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য আঙ্গিক', *গ্রাম থিয়েটার*, ৩৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুলাই ২০১৭, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ঢাকা।

রহমান, লুৎফর (অপ্রকাশিত) 'বাংলা নাট্যরীতিঃ সম্ভাবনার দিগন্তে'।

হাসান, মো. কামরুল (২০১৮), 'জাতি-জাতীয়তাবাদ', *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা*, মাসউদ ইমরান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

স্যুভেনির/প্রচার পুস্তিকা/ স্মরণিকা

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী' নাটকের স্যুভেনিওর।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচ্য' প্রযোজনার স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত 'ন-নৈরামণি' প্রযোজনার স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত 'বিনোদিনী' নাটকের স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত 'নিমজ্জন' নাটকের স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত 'ধাবমান' নাটকের স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত ‘নষ্টনীড়’ নাটকের স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত ‘দ্য টেম্পেস্ট’ নাটকের স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত ‘সেলিম আল দীন উৎসব ২০১৪’ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচার পুস্তিকা।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত ‘পুত্র’ নাটকের স্যুভেনিওর।

ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত ‘হাত হদাই’ নাটকের প্রচার পুস্তিকা।

ওয়েবসাইট

উসামা রাফিদ, ‘বিউপনিবেশায়ন এবং একজন ফাঞ্জ ফানোঁ’, https://roar.media/bangla/main/world/decolonization-and-frantz-fanon, সাবস্ক্রাইব : ১৫ মে ২০২২, রাত ৯.৩৭ মিনিট।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, https://graamtheatre.org/, সাবস্ক্রাইব : ২৭ মে ২০২২, রাত ১১.১৭ মিনিট।

[**Abstract:** Following Bangladesh's liberation from Pakistan through a war of independence, Dhaka Theatre emerged as a significant player in the country's theatrical landscape. Despite being labeled as a trendsetter for developing national theatre form based on the age-old tradition of the country, its initial productions, however, followed western styles like its peers.

However, the troupe, led by some freedom fighters, underwent a significant shift in terms of the structure of plays, production, and acting styles as part of its initiatives to develop a unique theatre language based on traditional performing arts like narration, lyrical, and poetry for contemporary audiences. Another notable feature of this unique style is the interwoven and frequent transformation of narration and characters by the actors. Guided by the post-colonial spirit, this initiative simultaneously challenged conventional Western theatre styles. They coined this narrative style 'Kathanatya'.

They established this theatre style by producing unique productions such as 'Chaka,' 'Jaibati Kanyar Mon,' and 'Hargaj,' authored by the Selim Al Deen, the main theoretician and playwright of Dhaka Theatre. Dhaka Theatre also shed light on the culture and struggles of other ethnic groups residing in Bangladesh, portrayed through productions like 'Bonpansul.' The play delves into the life, culture, struggles, and oppression faced by the Mandai ethnic minority group in the Madhupur region. Their resilience amidst Bengali majority oppression was depicted through the script crafted in the Panchali style. Subsequently, Dhaka Theatre staged 'Dhaboman,' providing a unique portrayal of humanity's decline in a war-ravaged, materialistic world.

Today, Dhaka Theatre stands as an inspiration for the entire nation, its influence extending beyond national borders with international recognition. Thus, the style pioneered by Dhaka Theatre can rightly be acknowledged as a national phenomenon, given its widespread impact and the involvement of a large segment of the population.]